শ্রীঅরবিন্দ

যোগসাধনার ভিত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

যোগ-সাধনার ভিত্তি

কালচার পাব্‌লিশার্স
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

[শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে সঙ্কলন করিয়া ইংরাজি Bases of Yoga নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ; এই পুস্তকখানি তাহারই বাংলা অনুবাদ।]

প্রথম মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৪৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৪৯
তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫৭

প্রকাশক : শ্রীতারাপদ পাত্র, দি কাল্‌চার পাবলিশার্স, ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মুদ্রাকর : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরি

সূচীপত্র

স্থিরতা—শান্তি—সমতা

মন যদি চঞ্চল থাকে তবে যোগের কোন ভিত্তি গড়া সম্ভব হয় না। প্রথমেই দরকার মনের নিশ্চলতা। আবার ব্যক্তি-চেতনাকে লোপ করে দেওয়াও এ যোগের প্রথম লক্ষ্য নয়—প্রথম লক্ষ্য হল ব্যক্তি-চেতনাকে একটা ঊর্দ্ধতর চেতনার দিকে খুলে ধরা—এ জন্যেও নিশ্চল মন হল প্রথম প্রয়োজন।

*
* *

সাধনায় প্রথমেই যে কাজটি করা দরকার তা হল মনে একটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ শান্তি ও নিস্তব্ধতা লাভ করা। অন্যথা, তোমার নানা অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী কিছুই হবে না। নিস্তব্ধ মনের মধ্যেই সত্য-চেতনা গড়ে তোলা যায়।

*
* *

নিশ্চল মন অর্থ এমন নয় যে কোন চিন্তা বা মানসবৃত্তি আদৌ থাকবে না—এ সব থাকবে শুধু উপরে-উপরে, আর তোমার সত্য সত্তাকে তুমি অনুভব করবে ভিতরে, এ সকল হতে সে বিচ্ছিন্ন, এ সকল দেখে কিন্তু এদের স্রোতে ভেসে যায় না, এদের পর্য্যবেক্ষণ করবার বিচার করবার ক্ষমতা রাখে, যা বর্জ্জন করতে হবে তা বর্জ্জন করে, যা কিছু সত্য-চেতনা সত্য-অনুভূতি তা গ্রহণ করে, ধারণ করে।

মনের নিশ্চেষ্টতা ভাল জিনিষ, কিন্তু সাবধান, নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে কেবল সত্যের কাছে, ভাগবত-শক্তির স্পর্শের কাছে।

নিম্নতন প্রকৃতির কুমন্ত্রণা ও প্রভাবের কাছে তুমি যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক, তা হলে সাধনায় অগ্রসর হতে পারবে না, অথবা এমন সব বিরোধী-শক্তির কবলে পড়ে যাবে যারা তোমাকে যোগের সত্য পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে ফেলতে পারে।

মায়ের কাছে আস্পৃহা নিয়ে এস যাতে মনের এই শুদ্ধতা ও স্থিরতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়, যাতে তুমি নিরন্তর তোমার এই আন্তর সত্তাকে অনুভব করতে পার, অনুভব করতে পার সে আন্তর সত্তা বাহ্য প্রকৃতি হতে সরে পিছনে দাঁড়িয়ে, জ্যোতির ও সত্যের দিকে ফিরে রয়েছে।

সাধনার পথে যে সব শক্তি অন্তরায় তারা হল মন-প্রাণ-দেহগত অধস্তন প্রকৃতির শক্তি। এদের পশ্চাতে আবার রয়েছে মনোময়, প্রাণময় ও সূক্ষ্মদেহময় লোকের শত্রুশক্তিরাজি। এ সকলের ব্যবস্থা তখনই করা সম্ভব যখন মন ও হৃদয় একাগ্র হয়েছে, ভগবানের দিকে অনন্যগতি আস্পৃহায় সমাহিত হয়েছে।

*
* *

নিস্তব্ধতা সর্ব্বদাই ভাল—তবে মনের নিশ্চলতা অর্থে যে একান্ত নিস্তব্ধতা তা আমি বলতে চাই না। আমি বলতে চাই এমন মন যা বিক্ষোভ, অশান্তি হতে মুক্ত, যা ধীর, লঘু, সুখী—ফলে, যে-শক্তি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন করবে তার কাছে সে আপনাকে খুলে ধরতে পারে। প্রধান কাজ হল অশান্তিকর ভাবনা, বিকৃত অনুভব, বিমিশ্র বুদ্ধি, অসুখকর বৃত্তি—এ সকলের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ যে একটা অভ্যাসে পরিণত হয় তা থেকে মুক্ত হওয়া। এ সব জিনিষ প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করে, আচ্ছন্ন করে, মহাশক্তির পক্ষে কাজ করা দুরূহ করে তোলে। মন যখন অচঞ্চল ও প্রশান্ত তখনই মহাশক্তি অনেক সহজে কাজ করতে পারে। তোমার মধ্যে কোন কোন বস্তু পরিবর্ত্তন করতে হবে, সব দেখবে বটে—কিন্তু এ-কাজটি যতখানি বিপর্য্যস্ত

অবসাদগ্রস্ত না হয়ে করতে পারবে, পরিবর্ত্তন ততখানি সহজ-সাধ্য হয়ে উঠবে।

*
* *

শূন্য মন আর স্থির মনে পার্থক্য এই—মন যখন শূন্য তখন চিন্তা নাই, ধারণা নাই, কোন রকম মানসিক ক্রিয়া নাই, আছে শুধু বস্তু-সকলের একটা মূল প্রতীতি, কিন্তু তাদের বুদ্ধিগত কোন পরিণত রূপ নাই ; স্থির মনে মানস-সত্তার সার-বস্তুটি নিশ্চল হয়ে যায়, এমন নিশ্চল যে কোন কিছুই তাকে আলোড়িত করতে পারে না। চিন্তা বা কোন ক্রিয়া যদি হয়, তবে মনের ভিতর হতে তা ওঠে না, আসে বাহির হতে—সে সব মনের উপর দিয়ে চলে যায়. নিবাত নিষ্কম্প আকাশকে অতিক্রম করে পাখীর ঝাঁক যেমন চলে যায়—চলে যায়, কিন্তু কিছুই বিক্ষুব্ধ করে না, কোন চিহ্ন রেখে যায় না। হাজার প্রতিচ্ছবি, প্রচণ্ড ঘটনাবলী যদি তার উপর দিয়ে বয়ে যায়, তবু স্থির অচঞ্চলতা তার অটুট থাকে—যেন মনের গড়নই হয়েছে শাশ্বত অবিনশ্বর শান্তির উপাদানে। এই স্থিরতা যে মন অর্জ্জন করেছে, সে মন কাজ করতেও সুরু করতে পারে—এমন কি সবলে ও সবেগে কাজ করতে পারে ; তবু তার অন্তঃস্থ স্তব্ধতা সে অক্ষুণ্ণ রাখবে, নিজের ভিতর থেকে কিছু উৎপাদন করবে না, শুধু গ্রহণ করবে উপর থেকে যা আসে তাকে, এর একটা মানস আকৃতি মাত্র দেবে কিন্তু নিজস্ব কিছু তাতে মিশিয়ে ধরবে না—এ কাজ করবে স্থিরভাবে রাগ-বিবর্জ্জিত হয়ে, তবে সত্যের আনন্দে সে ভরপুর থাকবে, আর সত্যের বাহন হয়েছে বলে একটা প্রসন্ন শক্তি ও জ্যোতি তাকে পরিপূর্ণ করে রাখবে।

*
* *

নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া, চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়া, মনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় জিনিষ নয়—মন যখন নিস্তব্ধ, প্রায়ই

তখন উপর হতে একটা বৃহৎ শান্তির পূর্ণ অবতরণ হয় আর সেই বৃহৎ শান্তির মধ্যে উপলব্ধি হয় মনের ঊর্দ্ধে আপন বৃহৎ সত্তাকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করে রেখেছে যে শান্ত আত্মা। তবে বিপদ এই, শান্তি ও মনের স্তব্ধতা যখন লাভ হয়েছে তখন প্রাণাশ্রিত মন ছুটে এসে সে জায়গাটি জুড়ে বসতে চেষ্টা করে, কিম্বা ঐ উদ্দেশ্যেই যন্ত্রবৎ চালিত জড়াশ্রিত মন এসে তার যাবতীয় তুচ্ছ অভ্যাসগত চিন্তার চক্র আবর্ত্তন করে চলে। এ অবস্থায় সাধকের কর্ত্তব্য সজাগ থেকে এ সব আগন্তুকদের দূর করে দেওয়া অথবা নীরব করে দেওয়া, যাতে ধ্যানের সময়টুকু অন্ততঃ মনের ও প্রাণের শান্তি ও স্থিরতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর থাকে। একাজটি সব চেয়ে সুষ্ঠুভাবে করা যায় যদি তোমার থাকে একটা সুদৃঢ় এবং নীরব সঙ্কল্প। সে সঙ্কল্প হল মনের পিছনে যে পুরুষ তার সঙ্কল্প। মন যখন প্রশান্ত, যখন সে নীরব তখনই পুরুষের অনুভূতি হয়—পুরুষও নীরব, প্রকৃতির ক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন।

শান্ত, অবিচল, আত্মার মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত—"ধীর স্থির"—হতে হলে মনের এই অচঞ্চলতা, বাহ্য প্রকৃতি হতে আন্তর পুরুষের এই বিচ্ছেদ বিশেষ সহায়, প্রায় অপরিহার্য্য প্রয়োজন। সত্তাটি যতদিন চিন্তারাশির ঘূর্ণি অথবা প্রাণবৃত্তির বিক্ষোভে কবলিত ততদিন আত্মার মধ্যে এই শান্ত স্থির প্রতিষ্ঠা হয় না। এ সকল থেকে নিজেকে মুক্ত করে সরে দাঁড়ান, নিজের থেকে এ সকলকে পৃথক অনুভব করা একান্ত প্রয়োজন।

তোমার যথার্থ ব্যক্তিটি আবিষ্কার করতে হলে, তোমার প্রকৃতির মধ্যে তাকে গড়ে তুলতে হলে দুটি জিনিষ প্রয়োজন—প্রথম, হৃদয়ের পশ্চাতে অন্তঃপুরুষ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, আর তারপর, প্রকৃতি হতে পুরুষের এই পৃথক-করণ। কারণ সত্যকার ব্যক্তিটি রয়েছে পিছনে, বাহ্য প্রকৃতির কর্ম্মাবলীর আবরণ-অন্তরালে।

*

* *

শান্তির এক বিপুল তরঙ্গ (বা সাগর), এক বিশাল ও জ্যোতির্ম্ময় সদ্‌বস্তুর নিরন্তর চেতনা—পরম সত্যটি যখন সবে প্রথম মনকে ও অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে তখন তার মূল উপলব্ধিটি আসে এই রূপ নিয়ে। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সূচনা বা প্রতিষ্ঠা কামনা করা যায় না—এ যেন পাষাণের ভিত্তি, এরই উপরে ভর ক'রে আর অবশিষ্ট সব গড়ে তোলা যায়। কিন্তু এর অর্থ শুধু "একটা কিছুর অধিষ্ঠান" নয়, এর অর্থ সেই একমাত্র সত্তার অধিষ্ঠান—এই অনুভূতিটিকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ না ক'রে বা এর স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রে, একে দুর্ব্বল করা মস্ত ভুল।

এর কোন সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, এমন কি কোন একটি রূপের মধ্যে একে বেঁধে রাখবার চেষ্টাও করা উচিত নয়; কারণ এ অধিষ্ঠানের স্বরূপ হল অসীমতা। আপনার যতটুকু বা আপনার ভিতর হতে যা-কিছু প্রকাশ করতে হবে, তা সে নিজের শক্তির জোরে অনিবার্য্যভাবে করবে—প্রয়োজন কেবল একে নিরন্তর স্বীকার করে চলা।

এ যে ঊর্দ্ধ হতে অবতীর্ণ করুণা তাতে কিছুমাত্র ভুল নাই—এমন করুণার একমাত্র প্রতিদান একে গ্রহণ করা, কৃতজ্ঞ থাকা আর যে-শক্তি তোমার চেতনাকে স্পর্শ করেছে তার দিকে নিজেকে খুলে রাখা, তাকে ছেড়ে দেওয়া যাতে তোমার মধ্যে যা গড়বার তা সে গড়ে তুলতে পারে। প্রকৃতির পূর্ণরূপান্তর এক মুহূর্ত্তে হয় না—এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় এবং স্তরের পর স্তরের একটা ক্রমানুসরণ। বর্ত্তমানের অনুভূতিটি দীক্ষা মাত্র, নূতন যে চেতনার মধ্যে রূপান্তর সম্ভব হবে তার ভিত্তি। অনুভূতিটির অনায়াস স্বতঃস্ফূরণই প্রমাণ করে যে এ জিনিষ মনের, সঙ্কল্পের কি আবেগের রচিত কিছু নয়—এ এসেছে ও-সকলের ঊর্দ্ধের এক সত্য থেকে।

*
* *

সংশয়কে প্রত্যাখ্যান করা অর্থ নিজের চিন্তারাশির উপর কর্ত্তৃত্ব-

লাভ—এ কথা খুবই সত্য। চিন্তার সংযম প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন প্রাণগত কামনার ও আবেগের সংযম, যেমন প্রয়োজন দেহের গতিবিধির উপর সংযম। এ প্রয়োজন যোগসাধনার জন্য হয় বটে; কিন্তু কেবল যে যোগসাধনারই জন্য তা নয়। চিন্তার উপর যদি কর্ত্তৃত্ব না থাকে, যদি তাদের "সাক্ষী", "অনুমন্তা", "ঈশ্বর"—মনোময় পুরুষ—না হওয়া যায় তবে পূর্ণমাত্রায় মানস-জীবও হয়ে ওঠা যায় না। মনোময় জীবের পক্ষে অসংযত চিন্তারাজির খেলার পুতুল হওয়া সুসঙ্গত নয়, ঠিক সেই হিসাবে যে হিসাবে কামনার আবেগের তুফানে হাল-পালশূন্য নৌকার মত হওয়া তার পক্ষে সুসঙ্গত নয় কিম্বা শরীরের প্রবৃত্তি বা জড়তার দাস হওয়া সুসঙ্গত নয়। আমি জানি এ-কাজটি বেশি কঠিন, কারণ মানুষ মুখ্যতঃ মনোময় প্রকৃতির জীব, তাই সে তার মনের বৃত্তির সাথে নিজেকে এক করে ফেলে, হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পৃথক করে নিতে পারে না, মানস ঘূর্ণিপাকের আবর্ত্ত ও বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শরীরের উপর—অন্ততঃ শারীরিক ক্রিয়াদির অংশবিশেষের উপর সংযম তার পক্ষে বরং সহজ; প্রাণের বাসনা ও আবেগের উপর একটা মানস সংযম স্থাপন যদিও অত সহজ নয়, তবুও কিছু প্রয়াসের পরে তা সাধ্য—কিন্তু নদীর উপরে তান্ত্রিক যোগীর মত চিন্তারাশির ঘূর্ণিপাকের ঊর্দ্ধে বসে থাকা আরো বেশি দুষ্কর। তা সত্ত্বেও এ-কাজ করা যায়। সকল পরিণত-মানসের মানুষ, যারা সাধারণকে ছাড়িয়ে গিয়েছে তাদের, কোন না কোন প্রকারে, অন্ততঃ কোন না কোন সময়ে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনের এই দুটি অংশকে পৃথক করে ধরতে হয়েছে—একটি অংশ সক্রিয়, চিন্তার কারখানা, আর একটি প্রশান্ত, প্রভু, যুগপৎ সাক্ষী ও সঙ্কল্প-শক্তি, যে চিন্তারাজির পর্য্যবেক্ষণ করে, বিচার করে, প্রত্যাখ্যান করে, বহিষ্কার করে, গ্রহণ করে, পরিবর্ত্তন করে, মনোময় গৃহের গৃহপতি, আত্মরাজ্যচক্রবর্ত্তিত্বের—"সাম্রাজ্যের"—অধিকারী।

যোগী আরও অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। কেবল মনের মধ্যেই তিনি অধিপতি নন, মনের ভিতরে এক হিসাবে থেকেও তিনি যেন আবার মন হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন, তার থেকে আলাদা হয়ে একেবারে পিছনে বা উপরে স্থান নিয়েছেন, মুক্ত হয়ে আছেন। তাঁর সম্পর্কে "চিন্তার কারখানা" উপমাটি সম্পূর্ণরূপে আর প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি দেখছেন চিন্তা সব আসছে বাহির হতে, বিশ্ব-মন বা বিশ্ব-প্রকৃতি হতে—কখন তাদের নির্দ্দিষ্ট সুপরিস্ফুট রূপ থাকে, কখন বা থাকে না; যখন থাকে না, তখন তারা রূপ পায় আমাদের ভিতরে কোথাও। আমাদের মনের প্রধান কাজ হল এই সব চিন্তা-তরঙ্গকে (সেই সাথে প্রাণতরঙ্গ এবং সূক্ষ্ম-জড়শক্তি-তরঙ্গকেও বটে) সাদরে গ্রহণ করা বা তাদের বর্জ্জন করা অথবা পরিবেষ্টনী প্রকৃতি-শক্তি হতে আসে যে চিন্তা-বস্তু (বা প্রাণের বৃত্তি) তার এই রকমে একটা ব্যক্তিগত মানস-আকার দেওয়া।

মনোময় পুরুষের মধ্যে কি সম্ভাবনা সব রয়েছে তার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না—নিজের গৃহে গৃহপতি সে হতে পারে, হতে পারে মুক্ত সাক্ষী। যার শ্রদ্ধা আছে, দৃঢ় সঙ্কল্প আছে তার পক্ষে মনের উপর একটা ক্রমবর্দ্ধমান কর্ত্তৃত্ব এবং এই মুক্তি অর্জ্জন করা খুবই সাধ্যায়ত্ত।

*
* *

প্রথম ধাপ হল অচঞ্চল মন—নিস্তব্ধতা পরের ধাপ, তা হলেও অচঞ্চলতা থাকাই চাই। অচঞ্চল মন বলতে আমি বুঝি ভিতরে এমন একটা মানসচেতনা যে দেখছে চিন্তা সব তার কাছে আসে, এদিক ওদিক চলে বেড়ায় কিন্তু সে অনুভব করে না নিজে সে চিন্তা করছে কিম্বা চিন্তারাজির সাথে আপনাকে এক করে ফেলছে বা তাদের নিজের বলে বিবেচনা করছে। চিন্তারাশি, মানসবৃত্তি সব তার ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে—ঠিক যেমন পথিকেরা অন্যত্র হতে একটা নিস্তব্ধ রাজ্যে এসে উপস্থিত হয় আর পার হয়ে চলে

যায়—অচঞ্চল মন তাদের পর্য্যবেক্ষণ করে অথবা পর্য্যবেক্ষণ করবারও গরজ তার থাকে না, তবে উভয়ত্রই সে ক্রিয়াশীল হয় না বা তার অচঞ্চলতা হারায় না। নিস্তব্ধতা অচঞ্চলতার চেয়ে বেশি কিছু; তা অর্জ্জন হয় আভ্যন্তরীণ মন থেকে চিন্তা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করে, তাকে নীরব রেখে কিম্বা চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে একেবারে চিন্তার বাহিরে ধরে রেখে। কিন্তু নিস্তব্ধতা আরও সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় উপর হতে এক অবতরণের ফলে—তখন অনুভব হয় ও-জিনিষটি নেমে আসছে, ব্যক্তিগত চেতনার ভিতরে প্রবেশ করছে, তাকে অধিকার করছে বা চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, আর সে চেতনা ক্রমে বিশাল নির্ব্যক্তিক নিস্তব্ধতার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

*
* *

শান্তি (Peace), স্থিরতা (Calm), অচঞ্চলতা (Quiet), নিস্তব্ধতা বা নিশ্চল নীরবতা (Silence)—এ কথাগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব অর্থ-বৈশিষ্ট্য আছে, তবে তা সহজে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় না।

অচঞ্চলতা—যে অবস্থায় কোন চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভ নাই।

স্থিরতা—আরও অটল অবস্থা, কোন বিক্ষোভই তাকে স্পর্শ করে না। অচঞ্চলতার অপেক্ষা এটি কম অভাবাত্মক অবস্থা।

শান্তি—আরও বেশি ভাবাত্মক অবস্থা, এর মধ্যে আছে একটা সুপ্রতিষ্ঠ সুসমঞ্জস বিশ্রান্তি ও মুক্তির অনুভব।

নিস্তব্ধতা হল সেই অবস্থা যেখানে হয় মনের বা প্রাণের কোন ক্রিয়াই নাই কিম্বা আছে এমন একটা নিস্পন্দতা যাকে কোন বাহ্য ক্রিয়া ভেদ করতে বা পরিবর্ত্তন করতে পারে না।

*
* *

অচঞ্চলতাটি বজায় রেখ—আপাততঃ এ যদি অন্তঃশূন্য অচঞ্চলতাই হয় তাতে দৃক্‌পাত করবে না। অনেক সময়ে চেতনাকে একটি

পাত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে—তা থেকে ভেজাল বা অবাঞ্ছনীয় পদার্থ সব ঢেলে ফেলে তাকে খালি করতে হয়; কিছুকাল খালিই রাখতে হয়, যতদিনে নূতন ও সত্য, খাঁটি ও বিশুদ্ধ জিনিষ দিয়ে তাকে ভরা না যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে, পাত্রটি যেন পুনরায় সেই পুরানো ময়লা উপকরণ দিয়ে ভর্ত্তি না করা হয়। ততদিন ধৈর্য্য ধরে থাক, উপরের দিকে নিজেকে খুলে দাও; ধীরভাবে স্থিরভাবে, অতিরিক্ত চঞ্চল ব্যাকুল না হয়ে, আবাহন কর যাতে সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্তি নেমে আসে, আর শান্তি এসে গেলে, যাতে আসে আনন্দ আর ভগবৎ-সান্নিধ্য।

*
* *

স্থিরতাকে প্রথম দৃষ্টিতে একটা অভাবাত্মক জিনিষ বলে বোধ হয় বটে, কিন্তু জিনিষটি অর্জ্জন করা এত কঠিন যে আদৌ যদি লাভ হয় তবে বিবেচনা করতে হবে সাধনায় অনেকখানি অগ্রসর হওয়া গিয়েছে।

বস্তুতঃ কিন্তু স্থিরতা অভাবাত্মক জিনিষ নয়—ভাবাত্মক, সৎপুরুষের নিজস্ব প্রকৃতি, ভাগবত চেতনার বনিয়াদ। আর অন্য যা কিছু অভীষ্ট হোক আর অধিগত হোক, এটি বজায় রাখতেই হবে। এমন কি জ্ঞান শক্তি আনন্দ এলেও যদি এ ভিত্তিটি না থাকে তবে তারা দাঁড়াতে পারে না, তাদের ফিরে যেতে হয়, যতদিনে সৎপুরুষের দিব্য বিশুদ্ধি ও শান্তি সেখানে স্থায়ী না হয়।

ভাগবত চেতনার বাকী আর যা তার জন্য আস্পৃহা-পরায়ণ হও, তবে সে আস্পৃহা হয় যেন স্থির গভীর। স্থির হলেও সে আবার হতে পারে তীব্র—কিন্তু অধীর নয়, রাজসিক ব্যাকুলতায় পূর্ণ নয়।

কেবল অচঞ্চল মন ও অচঞ্চল সত্তার মধ্যে অতিমানস সত্য তার সত্য-সৃষ্টি গড়ে তুলতে পারে।

*
* *

মানসস্তর দিয়েই সাধনায় অনুভূতির আরম্ভ—কেবল দেখা দরকার অনুভূতি যাতে হয় যথার্থ, খাঁটি। যোগের সাধনোপায় সর্ব্বপ্রথমে হল দুটি—মনের মধ্যে বুদ্ধির ও সঙ্কল্পশক্তির চাপ আর হৃদয়ে ভগবানের দিকে ভাব-প্রবেগ, আর সকলের আগে যে ভিত্তি স্থাপন করতে হয় তাই হল শান্তি, শুদ্ধি আর স্থিরতা (সেই সাথে নিম্নতন চাঞ্চল্যের প্রশমন)। প্রথম অবস্থায় এটি অর্জ্জন করা হল স্থুলাতীত লোকের আভাস পাওয়া বা সূক্ষ্ম রূপ দর্শন সূক্ষ্ম বাণী শ্রবণ কি বিশেষ শক্তিলাভ অপেক্ষা অনেক বেশি প্রয়োজন। শুদ্ধি ও স্থিরতা যোগ-সাধনার প্রথম প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত ধরণের অনুভূতি (সূক্ষ্ম লোক, সূক্ষ্ম রূপ, সূক্ষ্ম বাণী প্রভৃতি) রাশিকৃত হতে পারে, কিন্তু অশুদ্ধ বিক্ষুব্ধ চেতনার মধ্যে এ সব অনুভূতি ঘটে বলে তারা সাধারণতঃ হয় অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও বিমিশ্র।

গোড়ায় শান্তি ও স্থিরতা নিরবচ্ছিন্ন হয় না—আসে আবার চলে যায়—স্বভাবের মধ্যে তাদের স্থায়ী করে তোলা বহুসময়সাপেক্ষ। সুতরাং অধীরতা পরিহার করে, যে কাজটি সুরু হয়েছে তাতেই স্থিরভাবে লেগে থাকা শ্রেয়। শান্তি ও স্থিরতার অতিরিক্ত আরো যদি কিছু তোমার কাম্য থাকে, তবে তা হয় যেন তোমার অন্তঃসত্তার পূর্ণ উন্মীলন আর তোমার মধ্যে যে ভাগবত-শক্তি কাজ করছে তার সম্বন্ধে চেতনা। এই যেন হয় তোমার ঐকান্তিক আস্পৃহা—সে আস্পৃহা অতি তীব্র হবে কিন্তু হবে না অধীর—তা হলে ও-জিনিষ আসবেই।

*
* *

এতদিনে সাধনার সত্যকার প্রতিষ্ঠা তোমার হল। এই স্থিরতা, শান্তি, সমর্পণই সেই যথাযথ আবেষ্টন যার মধ্যে আর অবশিষ্ট যা—জ্ঞান শক্তি আনন্দ—তারা আসতে পারে। এটি সম্পূর্ণ হতে দাও।

কাজে যখন ব্যাপৃত তখন এ জিনিষ থাকে না, তার কারণ এটি এখনও কেবল ঠিক মানস ক্ষেত্রের মধ্যেই আবদ্ধ, ঐটুকু মাত্র

সবে নিস্তব্ধ হতে শিখেছে। নব চেতনা যখন পূর্ণগঠিত হয়েছে, প্রাণপ্রকৃতি ও দেহসত্তাকেও সমগ্রভাবে অধিকার করেছে (প্রাণ এখন পর্য্যন্ত নীরবতার শুধু স্পর্শ পেয়েছে বা তার চাপে রয়েছে কিন্তু তার দ্বারা অধিকৃত হয় নাই), তখন এ ত্রুটি দূর হবে।

মনে এই যে শান্তির অচঞ্চল চেতনা তুমি এখন পেয়েছ তা কেবল স্থির হলে চলবে না, তার হওয়া দরকার ব্যাপক—তুমি তাকে সর্ব্বত্র অনুভব করবে, তুমি আছ তার মধ্যে, সমস্তই তার মধ্যে। আর এ অনুভব হলে কর্ম্মের মধ্যেও স্থিরতাকেই ভিত্তিরূপে ধরে রাখা তোমার পক্ষে সহজ হবে।

তোমার চেতনা যত ব্যাপক হবে, উপর হতে তত বেশি তুমি গ্রহণ করতে পারবে; মহাশক্তি নেমে আসতে পারবে, আধারের মধ্যে শান্তির সাথে সামর্থ্য ও জ্যোতি নিয়ে আসতে পারবে। যে জিনিষটিকে তোমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বলে অনুভব কর তা হল স্থূল মন—এটি প্রশস্ত হয়ে উঠতে পারে তখনই যখন এই প্রশস্ততর চেতনা ও জ্যোতি নেমে এসে আধারকে অধিকার করে।

যে স্থূল তামসিকতায় তুমি ভুগছ তা হ্রাস পেতে পারে ও দূর হতে পারে এক তখনই যখন উপর থেকে সামর্থ্য আধারের মধ্যে নেমে এসেছে।

অচঞ্চল হয়ে থাক, নিজেকে খুলে ধর, ভাগবত শক্তিকে আহ্বান কর যেন তিনি স্থিরতাকে ও শান্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, চেতনাকে প্রশস্ততর করেন, বর্ত্তমানে যতখানি সে গ্রহণ করতে ধারণ করতে পারে ততখানি আলো ও শক্তি তার মধ্যে নিয়ে আসেন।

দেখো, অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা যেন এসে না পড়ে—তাতে যতটুকু অচঞ্চলতা ও সাম্য তোমার প্রাণপ্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে তা ভেঙ্গে যেতে পারে।

শেষ পরিণাম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থেকো—পরাশক্তিকে তার কাজ করবার সময় দাও।

*

* *

আস্পৃহা-পরায়ণ হও, ঠিক মনোভাবটি নিয়ে একাগ্র হও—তা হলে বাধাবিপত্তি যতই থাক, যে লক্ষ্য তুমি সম্মুখে ধরেছ তাতে সিদ্ধি তোমার হবেই।

পিছনে যে শান্তি তার মধ্যে, তোমার ভিতরে যাকে বলছ "সত্যতর কিছু" তার মধ্যে বাস করা, আর সে বস্তুটি যে তুমি নিজে স্বয়ং, এই অনুভব করা তোমাকে শিখতে হবে। আর যা কিছু তা তোমার সত্যকার সত্তা নয় মনে করবে, তা হল নিত্য-পরিবর্ত্তিত ও পুনঃ-পুনঃ-আগত একান্ত বাহ্যিক বৃত্তিরাজির প্রবাহমাত্র—সতকার সত্তার আবির্ভাবের সাথে সাথেই তারা অন্তর্হিত হতে বাধ্য।

আসল প্রতিকার হল শান্তি। কঠোর কর্ম্মের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকা শুধু সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে—অবশ্য কর্ম্ম সর্ব্বদাই খানিকটা প্রয়োজন, আধারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য। মাথার উপরে ও চারিপাশে শান্তি রয়েছে অনুভব করা হল প্রথম ধাপ—এই শান্তির সাথে তোমার সংযোগ স্থাপন করতে হবে, তোমার মধ্যে তাকে নামিয়ে আনতে হবে, তা দিয়ে তোমার মন প্রাণ দেহ পূর্ণ করে তুলতে হবে, তা থাকবে তোমাকে ঘিরে, তুমি বাস করবে তার মধ্যে। ভগবানের জাগ্রত সান্নিধ্যে তুমি যে রয়েছ তার একমাত্র চিহ্ন হল এই শান্তি—এ জিনিষই যদি তুমি পেয়ে গিয়ে থাক, তবে আর সব ক্রমে এসে যাবে।

বাক্যে সত্যপরায়ণতা, চিন্তায় সত্যপরায়ণতা বিশেষ প্রয়োজন। যতই তুমি অনুভব করতে পারবে যে মিথ্যা তোমার নিজস্ব অঙ্গ কিছু নয়, তা বাহির হতে তোমার উপরে এসে পড়ছে মাত্র, ততই তাকে প্রত্যাখ্যান করা, নিবারণ করা তোমার পক্ষে সহজ হবে।

অধ্যবসায়ের সাথে চল—কুটিল যা তা ঋজু হয়ে যাবে, জাগ্রত ভগবৎ-সান্নিধ্যের সত্য তুমি নিরন্তর দেখবে ও অনুভব করবে—প্রত্যক্ষ অনুভূতি তোমার বিশ্বাসের প্রমাণ এনে দিবে।

*
* *

প্রথমে আস্পৃহাপরায়ণ হও আর মায়ের কাছে প্রার্থনা কর যাতে মন হয় অচঞ্চল, আসে নির্ম্মলতা, স্থিরতা ও শান্তি, আর আসে প্রবুদ্ধ চেতনা, তীব্র ভক্তি এবং আন্তর ও বাহ্য সকল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার জন্য, যোগসাধনার শেষ অবধি পৌঁছিবার জন্য বল ও অধ্যাত্ম-সামর্থ্য। চেতনা যদি জাগ্রত হয়, আর থাকে ভক্তি ও আস্পৃহার তীব্রতা, তা হলে মনের পক্ষে ক্রমেই জ্ঞানসমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব হবে—অবশ্য যদি অচঞ্চলতা ও শান্তি তার ইতিমধ্যে অর্জ্জন করা হয়ে থাকে।

*
* *

এর কারণ দৈহিক সত্তার, বিশেষতঃ দেহগত প্রাণসত্তার চেতনায় এক তীব্রতা ও স্পর্শালুতা।

ক্রমে সচেতন হয়ে ওঠা দেহ-সত্তার পক্ষে ভাল, তবে এই সব সাধারণ-মানব-প্রকৃতি-সুলভ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সজাগ হয়েও তাতে অভিভূত, পীড়িত বা বিপর্য্যস্ত তা যেন কখন না হয়। মনের মধ্যে যেমন, দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যেও তেমনি একটা সবল সমতা, কর্ত্তৃত্ব-বোধ ও অনাশক্তি থাকা দরকার, যার কল্যাণে ও-সকল জিনিষ জেনেও, স্পর্শ করেও স্থূল-সত্তাটি কোন রকমে বিচলিত হবে না। পারিপার্শ্বিকের ক্রিয়াবলীর চাপ জানতে হবে, তাদের সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে আর তাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে, ঝেড়ে

ফেলতে হবে—কিন্তু কেবলই অনুভব করবে আর দুঃখভোগ করবে এমন যেন না হয়।

*
* *

নিজের দুর্ব্বলতা, অসত্যময় বৃত্তি সব দেখে স্বীকার করবে এবং তাদের হতে নিজেকে পৃথক করে সরিয়ে রাখবে—এই হল মুক্তির পথ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির মন ও স্থির প্রাণ নিয়ে জিনিষকে না দেখতে পারি, ততক্ষণ কাউকে বিচার করব না, এক নিজেকে ছাড়া—এটি খুবই ভাল নিয়ম। আরও, একটা বাহ্যরূপ দেখেই তার জোরে মনকে তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে দেবে না, কিম্বা প্রাণকে কাজে নেমে পড়তে দেবে না।

অন্তঃস্থ সত্তার মধ্যে এমন একটি স্থান আছে যেখানে সর্ব্বদাই শান্ত হয়ে থাকা যায়, সেখান হতে বহিঃস্থ চেতনার বিক্ষোভ সব অটল ভাবে এবং বিচারপূর্ব্বক দেখা যায়, তার পরিবর্ত্তনের জন্য তার উপর কাজ করা যায়। অন্তঃস্থ চেতনার স্থিরতার মধ্যে স্থিতি যখন পেয়েছ তখনই অটল প্রতিষ্ঠা তোমার লাভ হয়েছে।

*
* *

এ সকল জিনিষে নিজেকে বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ হতে দেবে না। সতত তোমার কেবল একটি কাজ করা দরকার—ভগবানের দিকে তোমার আস্পৃহা নিয়ে অটল থাকা, সমতার সাথে নির্লিপ্তভাবে সকল বাধা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া। যারা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চায়, তাদের পক্ষে ভগবানের স্থান সকলের আগে আর সব জিনিষই গৌণ।

নিজেকে নির্লিপ্ত রাখ—অন্তরে অন্তরে ভগবানের কাছে

সমর্পিত যে মানুষটি তার প্রশান্ত আন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখ এ সকল জিনিষ।

*
* *

বর্ত্তমানে তোমার অনুভূতি সব মানসস্তরে—এরকম হওয়া ঠিকই। অনেক সাধক যে অগ্রসর হতে পারে না, তার কারণ মানস ও অন্তরাত্মা প্রস্তুত হওয়ার আগেই সে তার প্রাণময় স্তরটি খুলে ধরে। মানসস্তরে সত্যকার অধ্যাত্ম-অনুভূতি কিছু আরম্ভ হওয়ার পরই হয় প্রাণময় স্তরে অকালে অবতরণ, তার ফল বিষম বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভ। এরকম যাতে না ঘটে সেদিকে সাবধান হতে হবে। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ হল মন আধ্যাত্মিক জিনিষের কোন রকম স্পর্শ পাওয়ার পূর্ব্বেই প্রাণময় বাসনাপুরুষ যদি অনুভূতি পেয়ে বসে।

সর্ব্বদা এই আস্পৃহা রাখবে যাতে মন ও অন্তঃপুরুষ সত্যকার চেতনায় ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রস্তুত হয়ে ওঠে। আস্পৃহা রাখবে বিশেষভাবে অচঞ্চলতার জন্য, শান্তির জন্য, প্রশান্ত নিষ্ঠার জন্য, ক্রমবর্দ্ধমান অবিচল প্রসারতার জন্য, অধিক হতে অধিকতর জ্ঞানের জন্য, গভীর তীব্র অথচ স্থির ভক্তির জন্য।

তোমার পারিপার্শ্বিক ও তার বিরুদ্ধতায় বিক্ষুব্ধ হবে না। এ সব অবস্থা অনেক সময়ে প্রথম প্রথম বিহিত করা হয় এক রকম অগ্নি-পরীক্ষার জন্য। এমন অবস্থার মধ্যেও যদি তুমি অন্তরে নিজেকে চঞ্চল না হতে দিয়ে প্রশান্ত অবিচলিত থেকে সাধনা সমানভাবে করে যেতে পার, তবে তাতে অত্যন্ত আবশ্যক এক সামর্থ্য তুমি লাভ করবে। কারণ যোগের পথ সততই বাহিরের ও ভিতরের বাধায় পরিপূর্ণ—এ সবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে সাধকের অচঞ্চল দৃঢ় জমাট সামর্থ্য গড়ে তুলতে হবে।

*
* *

ভিতরের আধ্যাত্মিক উন্নতি বাহিরের অবস্থার উপর ততখানি নির্ভর করে না, যতখানি করে আমরা ভিতর হতে সে অবস্থায় কি ভাবে সাড়া দেই তার উপর। আধ্যাত্মিক অনুভূতির চিরকাল এই চরম সিদ্ধান্ত। আর সেই জন্যেই যথাযথ মূল ভাবটি ধরা ও বজায় রাখা, বাহ্য ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে না এমন এক ভিতরের অবস্থা, সমতার ও স্থিরতার অবস্থা—যদি একেবারে প্রথমেই তা আন্তর সুখের অবস্থা না-ও হয়—জীবনের আঘাত প্রতিঘাতে সদাসর্ব্বদা অভিভূত বাহ্য-মনের মধ্যে বাস না ক'রে ক্রমেই গভীরে ভিতরের দিকে চলা এবং ভিতর থেকে বাহিরের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা—এই সব জিনিষেরই উপর আমরা জোর দিয়ে থাকি। একমাত্র এই রকম ভিতরের অবস্থার কল্যাণেই জীবনের চেয়ে ও জীবনের যত বিক্ষোভের শক্তি তাদের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠা যায়, শেষে বিজয়ের আশা করা যায়।

ভিতরে অচঞ্চল থাকা, শেষ অবধি চলার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা, বাধা বা বৈপরীত্যে কিছুতেই বিক্ষুব্ধ বা নিরুৎসাহ না হওয়া—এই হল এ যোগপথে প্রথমে শিখবার বিষয়। অন্যথা, তুমি যে অভিযোগ করছ চেতনা অস্থির, অনুভূতিকে ধরে রাখা দুরূহ, এ সব জিনিষ প্রশ্রয়ই পাবে। যদি অন্তরে শান্ত স্থির থাকতে পার, কেবল তবেই তোমার অনুভূতির ধারা স্থিরভাবে বিকশিত হতে পারে। অবশ্য মাঝে মাঝে সাধনা যে বন্ধ হয়ে যায় না বা নীচে পড়ে যায় না তা নয়; তবুও এ সকল অবস্থাকে যদি যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা যায় তবে সাধনার অভাব নয়, বরং তারা ভিতরে ভিতরে পরিপাকের বা বাধাক্ষয়ের অবস্থা হয়ে উঠতে পারে।

বাহ্য ব্যবস্থাদির অপেক্ষা বেশি প্রয়োজন একটা আধ্যাত্মিক অবস্থা। এ জিনিষ যদি লাভ করা যায়, উপরন্তু নিজের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অর্থাৎ যার মধ্যে সর্ব্বদা বাস করা যায়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা যায় যদি নিজেই তৈরী করে নিতে

পারা যায়, তবে তাই হবে সাধনায় অগ্রসর হওয়ার পক্ষে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা।

*
* *

ভাগবত-শক্তি গ্রহণ করবার সামর্থ্য লাভ করতে যদি চাও, বাহ্য-জীবনের সকল বিষয়ে তাকে কাজ করতে যদি দিতে চাও, তা হলে তিনটি জিনিষ আগে অধিকার করা দরকার :—

(১) **অচঞ্চলতা, সমতা**—যা ঘটুক না কেন কিছুতেই বিক্ষুব্ধ হবে না, মনকে স্থির ও দৃঢ় রাখবে—শক্তিরাজির লীলা শুধু দেখে যাবে, অথচ মন নিজে থাকবে প্রশান্ত।

(২) **অব্যভিচারী শ্রদ্ধা**—এই শ্রদ্ধা যে, পরিণামে পূর্ণমঙ্গল যা তাই ঘটবে, আর সেই সাথে এই শ্রদ্ধাও যে, আমরা যদি সত্যকার যন্ত্র হয়ে উঠি, তবে তার ফলে ঘটবে ঠিক সেই জিনিষ যাকে আমাদের নিজেদেরই সঙ্কল্প ভাগবত জ্যোতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার কর্ত্তব্যকর্ম্মরূপে সাক্ষাৎ দেখতে পার।

(৩) **গ্রহণ-সামর্থ্য**—ভগবৎশক্তিকে গ্রহন করবার, তার জাগ্রত অধিষ্ঠানকে এবং তার মধ্যে আবার মায়ের জাগ্রত অধিষ্ঠানকে অনুভব করবার ক্ষমতা, তাকে কাজ করতে দেওয়া যাতে আমাদের দৃষ্টিকে সঙ্কল্পকে কর্ম্মকে সে পরিচালিত করিতে পারে। যদি এই শক্তি ও জাগ্রত অধিষ্ঠান অনুভব করা যায়, আর এই সহজ-নম্যতা কর্ম্ম-চেতনার অভ্যাসেই পরিণত হয়—কিন্তু সে সহজ-নম্যতা থাকা চাই কেবল ভাগবত শক্তির কাছে, বিজাতীয় উপকরণ কিছু সে যেন সঙ্গে না নিয়ে আসে—তা হলে পরিণামে সাফল্য সুনিশ্চিত।

*
* *

সমতা এ যোগে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যেও সমতা রাখতে হয়—তার অর্থ ধীরভাবে স্থির-

ভাবে সহ্য করে চলা, চঞ্চল বিক্ষুব্ধ অবসন্ন বা হতাশ না হওয়া, ভগবানের ইচ্ছার উপর অবিচল বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু সমতা অর্থ জড়সুলভ নতি নয়। এই যেমন, সাধনায় কোন প্রয়াসের সাময়িক ব্যর্থতা যদি হয়, তবে সমতা অবশ্যই রাখতে হবে, উদ্বিগ্ন বা নিরুৎসাহ হলে চলবে না; কিন্তু তাই বলে ব্যর্থতাকে ভগবৎইচ্ছার ইঙ্গিত বলে যে গ্রহণ করতে হবে বা সে প্রয়াসকে বিসর্জ্জন দিতে হবে তা নয়। বরং তোমার বিফলতার হেতু ও অর্থ খুঁজে বের করা উচিত, পূর্ণ বিশ্বাসে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। রোগ সম্বন্ধেও ঐ এক কথা—উদ্বেজিত, বিচলিত, চঞ্চল নিশ্চয়ই হবে না; কিন্তু আবার রোগকে ভগবৎইচ্ছা বলে স্বীকারও করে নেবে না, বরং একে শারীরিক ত্রুটিরূপে দেখবে এবং প্রাণের ত্রুটি বা মনের ভ্রম যেমন দূর করতে চেষ্টা কর, একেও তেমনি দূর করতে চেষ্টা করবে।

*
* *

সমতা ব্যতিরেকে সাধনায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠা কিছু হতে পারে না। বাহ্য অবস্থা যত অপ্রীতিকর, অন্য মানুষের ব্যবহার যত বিরক্তিকর হোক না, পূর্ণ স্থিরতা নিয়ে, বিক্ষোভকর কোন প্রতিক্রিয়া না হতে দিয়ে সে সমস্তই গ্রহণ করা শিখতে হবে। এ সকল জিনিষেই সমতার পরীক্ষা। সব যখন সুন্দর ভাবে চলছে, মানুষও মনের মত অবস্থাও মনের মত, তখন স্থির ও সম থাকা সহজ। কিন্তু এরা যখন বিপরীত ধরণের তখনই স্থিরতা শান্তি সমতার পূর্ণতা পরীক্ষা করা যায়, তাদের দৃঢ়তর করা যায়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায়।

*
* *

তোমার যে অনুভূতি হয়েছিল তা থেকে বোঝা যায় আগে কি রকম ব্যবস্থা হলে তার ফলে আসে সেই অবস্থাটি যেখানে

ভাগবত-শক্তি অহংএর স্থান গ্রহণ করে, মন প্রাণ দেহকে যন্ত্র ক'রে নিয়ে কর্ম্মকে পরিচালিত করে। মনের গ্রহণ-সমর্থ নীরবতা, মানস অহংএর বিলোপ, মানস সত্তাকে কেবল সাক্ষীরূপে পরিণত করা, ভাগবতী শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, একমাত্র সেই ভাগবত প্রভাবের কাছে অনন্তভাবে সত্তাকে উন্মুক্ত করা—এই হল ভগবানের দ্বারা, শুধু ভগবানেরই দ্বারা চালিত ভাগবত যন্ত্র হয়ে উঠবার কটি ব্যবস্থা।

মন নীরব হলে অতিমানস চেতনাটি আপনা হতেই যে আসে তা নয়। মানুষী মন আর অতিমানসের মাঝে বহু অবস্থা বা লোক বা স্তর আছে। নীরবতা মনকে এবং সত্তার আর সব অংশকে মহত্তর জিনিষের দিকে খুলে ধরে—কখন বিশ্বগত চেতনার দিকে, কখন বা শান্ত আত্মার উপলব্ধির দিকে, কখন আবার ভগবানের সত্তা বা শক্তির দিকে, কিম্বা মানবের মানস-চেতনার অপেক্ষা একটা বৃহত্তর চেতনার দিকে। মনের নীরবতাই হল এ সব রকম অনুভূতি আসবার পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল অবস্থা, আমাদের যোগেও এই হল সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা (তবে একমাত্র অনুকূল অবস্থা নয়), যার কল্যাণে ভাগবতী শক্তি প্রথমে ব্যক্তি-চেতনার উপরে, শেষে তার মধ্যে অবতরণ করে, আর সে-চেতনার রূপান্তর সাধনের জন্য আপনার কাজ করে চলে,—তাকে প্রয়োজনমত অনুভূতি এনে দেয়, তার সমস্ত দৃষ্টি ও বৃত্তি পরিবর্ত্তন করে, ধাপে ধাপে পরিচালিত ক'রে নিয়ে অবশেষে তাকে তার চরম (অতিমানস) পরিবর্ত্তনটির জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলে।

*
* *

একখণ্ড নিরেট পাষাণের মত বোধ করা, এ অনুভূতিটির অর্থ বাহ্য-আধারের মধ্যে—বেশির ভাগ প্রাণময় জড়স্তরের মধ্যে—জমাট সামর্থ্য ও শান্তির অবতরণ। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই হল প্রতিষ্ঠা, পাকা ভিত্তি—এরই মধ্যে ভবিষ্যতে আর সব কিছু (আনন্দ, জ্যোতি, জ্ঞান,

ভক্তি) অবতরণ করতে পারে, এরই উপর ভর ক'রে তারা নিরাপদে দাঁড়াতে পারে, খেলা করতে পারে। অন্য অনুভূতিটির মধ্যে অসাড়তা ছিল বলছ, তার কারণ সেখানে গতি ছিল অন্তর্মুখী; কিন্তু এখানে যোগশক্তি চলেছে বাহিরের দিকে, পূর্ণ জাগ্রত বাহ্য-প্রকৃতির মধ্যে—এক্ষেত্রেও যোগ ও যোগানুভূতি যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার গোড়া পত্তনের জন্য। সুতরাং যে অসাড়তা হল বাহ্য-অঙ্গ হতে চেতনার প্রত্যাহরণের লক্ষণ তা এখানে নাই।

*
* *

প্রথমেই স্মরণ রেখ, সাধনা নির্ব্বিঘ্ন করতে হলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন চঞ্চল মন ও প্রাণের শুদ্ধির ফলে একটা আভ্যন্তরীণ প্রশান্তি। তারপরে স্মরণে রেখ, বাহ্য কর্ম্মের মধ্যে থেকেও মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করা অর্থ সাধনায় অনেকখানি অগ্রসর হওয়া, ভিতরের যথেষ্ট বেশি রকম উন্নতি না হলে এ জিনিষ লাভ করা যায় না। তবে সম্ভবতঃ যে বস্তুটি তোমার বিশেষ দরকার বলে তুমি বোধ কর অথচ যথাযথ নির্দ্দেশ করতে পার না তা হল এই অবিচ্ছিন্ন সুস্পষ্ট অনুভব যে মায়ের শক্তি তোমার ভিতরে কাজ করছে, উপর থেকে নেমে এসে তোমার সত্তার বিভিন্ন স্তর অধিকার করছে। এ অনুভব প্রায়ই আরোহণ ও অবরোহণ এই যুগ্মগতির পূর্ব্বাবস্থা—সময়ে তা নিশ্চয় আসবে। এসব জিনিষের প্রত্যক্ষ আরম্ভ হতে অনেক সময় লাগতে পারে, বিশেষতঃ এমন ক্ষেত্রে যেখানে মন অত্যন্ত সক্রিয় থাকতে অভ্যস্ত, নিস্তব্ধ থাকার অভ্যাস তার আদৌ নাই। এই সক্রিয়তা একটা যেন আবরণ টেনে দেয় এবং যতদিন সে রয়েছে, ততদিন মনের সচল যবনিকার পশ্চাতে অনেক কাজ করা হয়ে থাকে—সাধক মনে করে কিছুই হচ্ছে না অথচ তখনই বাস্তবিক পক্ষে অনেক জিনিষ তৈরী হয়ে ওঠে। তবে তুমি যদি দ্রুত ও প্রত্যক্ষ উন্নতি চাও, তবে তা একমাত্র সম্ভব যদি নিরন্তর

আত্মনিবেদনের ফলে তোমার অন্তঃপুরুষকে সম্মুখে নিয়ে আসতে পার। আস্পৃহা তোমার তীব্র হয়ে উঠুক কিন্তু তাতে অধীরতা যেন না থাকে।

*
* *

সাধনা করতে হলে মন, দেহ ও প্রাণশক্তি সবল থাকা দরকার। বিশেষতঃ তমঃ যাতে বহিষ্কৃত হয়, আধারের মধ্যে আসে তেজ সামর্থ্য তার ব্যবস্থা করতে হবে।

যোগপথ হবে জীবন্ত জিনিষ—এমন কিছু মানসিক নীতি বা ধরা-বাঁধা পদ্ধতি হবে না যাকে অন্ধভাবে ধরে থাকতে হবে, প্রয়োজন হলেও তাতে কোন ব্যতিক্রম করা চলবে না।

*
* *

বিচলিত না হওয়া, শান্ত থাকা, দৃঢ়বিশ্বাস রাখা—এইটিই হল চেতনার ঠিক ঠিক মূল ধারা। তবে সেই সাথে মায়ের সাহায্য গ্রহণ করাও দরকার; কোন কারণেই তাঁর অনুকম্পা হতে দূরে সরে দাঁড়ান উচিত নয়। আমি অসমর্থ, সাড়া দিতে অক্ষম এ রকমের ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না, নিজের ত্রুটি ও ব্যর্থতার কথা কেবলি চিন্তা করে বেদনায় ও লজ্জায় মনকে জর্জ্জরিত হতে দেবে না। এ সব ধারণা ও অনুভব শেষে বাস্তবিকই দুর্ব্বলতা নিয়ে আসে। বাধা-বিপত্তি যদি থাকে, পদস্খলন বা বিফলতা যদি ঘটেই, তবে এসব জিনিষ স্থিরভাবে দেখে যাবে, যাতে তারা দূর হয় তাই ভগবানকে সাহায্যের জন্য প্রশান্তভাবে ক্রমাগত ডাকবে, কখনও নিজেকে বিপর্য্যস্ত ব্যথিত নিরুৎসাহ হতে দেবে না। যোগপথ সহজ নয়, স্বভাবের সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তর একদিনে ঘটান যায় না।

*
* *

অবসাদ ও প্রাণস্তরে দ্বন্দ্ব যে এসেছে তার কারণ নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বেকার চেষ্টার মধ্যে ফলের জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ ও অতিরিক্ত আয়াস এইরকম ত্রুটি কিছু ছিল। তাই চেতনা যখন নীচে নেমে পড়ল, তখন ব্যথিত হতাশ উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণ উপরে ভেসে উঠল, তার ফলে প্রকৃতির প্রতিকূল দিক থেকে যত সংশয়ের নিরাশার জড়তার প্ররোচনা সব প্রবেশের মুক্ত পথ পেল। মানসিক চেতনায় যেমন, ঠিক তেমনি প্রাণে আর শারীর স্তরেও স্থিরতা ও সমতাপূর্ণ দৃঢ়প্রতিষ্ঠা যাতে হয় সেই দিকে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে। শক্তির আনন্দের পূর্ণ প্লাবন নেমে আসুক, কিন্তু আসে যেন একটা দৃঢ় ধারণসমর্থ আধারের মধ্যে—সর্ব্বাঙ্গীণ সমতাই এই সামর্থ্য ও দৃঢ়তা দিতে পারে।

*
* *

প্রসারতা ও স্থিরতা যোগযুক্ত চেতনার ভিত্তি এবং ভিতরের উন্নতি ও অনুভূতির পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবস্থা। যদি স্থূল চেতনায় এমন এক ব্যাপক স্থিরতা স্থাপন করা যায় যা শরীরকে পর্য্যন্ত, শরীরের যাবতীয় কোষ অবধি অধিকার করে, পূর্ণ করে থাকে, তবে তাই হতে পারে রূপান্তরের ভিত্তি। ফলতঃ এই ব্যাপকতা ও স্থিরতা ব্যতিরেকে রূপান্তর সম্ভব নয় বললেই হয়।

*
* *

সাধনার লক্ষ্য হল: চেতনা শরীরের বাহিরে এসে উর্দ্ধে স্থিতি লাভ করবে, চারিদিকে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রসারিত ক'রে দেবে, শরীরের সীমানায় আবদ্ধ থাকবে না। এভাবে মুক্ত হয়ে, সেই স্থিতিকে ছাড়িয়ে সাধারণ মানসকে ছাড়িয়ে উপরে যা-কিছু আছে তাদের দিকে নিজেকে খুলে ধরা যায়, উর্দ্ধ হতে যা কিছু সেখানে নেমে আসে তা গ্রহণ করা যায়, সেখান থেকেই নীচে যা-কিছু

আছে তা আবার নিরীক্ষণ করা যায়। এই রকমেই তখন পূর্ণমুক্ত সাক্ষীরূপে নীচের সকল জিনিষ দেখা আর তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়; আর উপরের যে বস্তু অবতরণ ক'রে শরীরের ভিতরে স্থান ক'রে নেয়—শরীরকে একটা ঊর্দ্ধতর প্রকাশের যন্ত্ররূপে প্রস্তুত ক'রে তোলবার জন্য, একটা ঊর্দ্ধতর চেতনা ও প্রকৃতি দিয়ে ঢেলে গড়বার জন্য—তার আধার, তার বাহন হওয়া যায়।

তোমার ভিতরে যা ঘটছে তা হল এই—চেতনা চেষ্টা করছে যাতে এই মুক্তির মধ্যে তার স্থির-প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঊর্দ্ধতর আসনে স্থিতি হলে পাওয়া যায় আত্মার স্বরূপগত মুক্তি আর বৃহৎ নীরবতা ও অব্যভিচারী স্থিরতা। তবে এই স্থিরতা শরীরের মধ্যে, যাবতীয় নিম্নস্তরের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে; সেখানে অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে সকল গতিবিধির পিছনে, সকল গতিবিধিকে সে ধারণ করে থাকবে।

*
* *

যদি তোমার চেতনা মাথার উপরে উঠে যায়, তার অর্থ চেতনা সাধারণ মনকে অতিক্রম ক'রে উপরের যে কেন্দ্র ঊর্দ্ধতর চেতনাকে গ্রহণ করে তার মধ্যে কিম্বা ঊর্দ্ধতর চেতনার নিজেরই ক্রমোচ্চস্তরের দিকে চলে যায়। এর প্রথম ফল, আত্মার স্বকীয় নীরবতা ও শান্তি—আর এই হল ঊর্দ্ধতর চেতনার ভিত্তি। পরে এ শান্তি ও নীরবতা নিম্নতর স্তরে, এমন কি দেহেরও মধ্যে নেমে আসতে পারে। জ্যোতিও নামতে পারে, আবার শক্তিও নামতে পারে। নাভি আর তার নীচে যে সব চক্র তারা হল প্রাণের ও দেহ-চেতনার—এখানেও ঊর্দ্ধতর শক্তির কিছু নেমে এসে থাকতে পারে।

শ্রদ্ধা—আস্পৃহা—সমর্পণ

ভাগবত সত্যকে আবিষ্কার করবার, শরীরী ক'রে ধরবার জন্য যে আস্পৃহা তাতেই জীবনের অখণ্ড উৎসর্গ, আর কোন কিছুতেই নয়—এই হল আমাদের যোগের নির্দ্দেশ। একদিকে ভগবান আর একদিকে এমন কোন বহির্মুখী লক্ষ্য ও কর্ম্ম, সত্যের সন্ধানের সাথে যার কোন সম্বন্ধ নাই—এই দুয়ের মধ্যে তোমার জীবনকে ভাগাভাগি ক'রে দেওয়া চলবে না। ও-রকম সামান্য কিছুমাত্র থাকলে যোগে সফলতা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

তোমাকে তোমার ভিতরে চলে যেতে হবে, অধ্যাত্ম-জীবনের কাছে যে পূর্ণ আত্মনিবেদন তাতে স্থিতিলাভ করতে হবে। সাধনায় যদি সাফল্য চাও তবে মানস পক্ষপাতের সকল টান ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে, প্রাণের নিজস্ব লক্ষ্য, কাম্য, আসক্তির উপর ঝোঁক দূর করতে হবে, আত্মীয় স্বজন স্বদেশের উপর অহংজাত মায়া মুছে ফেলতে হবে। বহির্মুখী প্রেরণা বা ক্রিয়ারূপে প্রকাশের যা দরকার তা উৎসারিত হবে সত্যলাভ হলে সেই লব্ধ সত্য থেকে, নিম্নতন মানস বা প্রাণগত প্ররোচনা থেকে নয়, ভগবৎ ইচ্ছা থেকে, ব্যক্তিগত পছন্দ বা অহংএর পক্ষপাত থেকে নয়।

*
* *

মানস মতবাদের আসল কোন মূল্য নাই। কারণ, সত্তার গতি যেদিকে মন তারি পরিপোষক মত গড়ে তোলে বা স্বীকার করে। আসল কথা হল ঐ গতি আর তোমার ভিতরের ডাক।

এক পরম সত্তা, চেতনা ও আনন্দ আছে—তা কেবল নেতিমূলক নির্ব্বাণ নয় কিম্বা স্থাণু অরূপ কৈবল্য নয়, পরন্তু তা হল গতিময়,—

এ জ্ঞান, আর এই বোধ যে ঐ ভাগবত চেতনা কেবল লোকাতীত নয়, তাকে এখানেও উপলব্ধি করা যায়, এবং এই জ্ঞান ও এই বোধের ফলে ভাগবত জীবনকে যোগের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা—এ জিনিষ মনের নয়। মানস মতবাদের কথা এখানে নাই—যদিও মনের সহায়ে এ দৃষ্টিভঙ্গীটি অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গীর মত, এমন কি তাদের অপেক্ষা সুষ্ঠুতর ভাবেই, সমর্থন করা যায়; এ হল অনুভূতির কথা—আর যতদিন অনুভূতি না আসে, ততদিন অন্তরাত্মার শ্রদ্ধা দিয়ে একে লাভ করতে হয়, অন্তরাত্মার শ্রদ্ধাই ততদিন এনে দেয় মনের ও প্রাণের আনুগত্য। এই উর্দ্ধতর জ্যোতির সাথে যার সংযোগ হয়েছে, যে অনুভূতি পেয়েছে, সে এ পথ ধরে চলতে পারে—তার আধারের নিম্নতর অঙ্গের পক্ষে এ অনুভবের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলা যত কঠিনই হোক না। এ বস্তুর যে স্পর্শমাত্রও পেয়েছে, তার সাক্ষাৎ-উপলব্ধি না থাকলেও, যদি ভিতরের ডাক থাকে, থাকে দৃঢ়প্রত্যয়, অন্তরাত্মার নিষ্ঠার অনন্যগতি, সেও এপথ অনুসরণ করতে পারে।

*
* *

ভগবানের ধারা মানব-মনের ধারা নয়, আমাদের রচিত পরিকল্পনারও অনুযায়ী নয়। ভগবানের ধারা বিচার করা অথবা তিনি কি করবেন আর না করবেন তার ব্যবস্থা দেওয়া অসম্ভব। কারণ আমরা যতদূরই জানি না কেন, ভগবান জানেন তারও বেশি। ভগবানকে যদি আদৌ স্বীকার করি, তবে আমার ত মনে হয় সত্যকার যুক্তি ও ভক্তি উভয়েই সমানে দাবি করে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণ।

*
* *

ভগবানের উপর নিজের মনের ধারাকে বা প্রাণের সঙ্কল্পকে আরোপ করা নয়, পরন্তু ভগবানের সঙ্কল্পকে বরণ করা ও অনুসরণ করাই হল সাধনার যথার্থ মূলভাবটি। বলবে না "এই আমার অধিকার,

আমার দরকার, আমার দাবি, আমার অভাব, আমার প্রয়োজন"। তার পরিবর্ত্তে নিজেকে দিয়ে দেবে, সমর্পণ করবে, ভগবান যা দেন তাই সানন্দে গ্রহণ করবে, দুঃখ না ক'রে, বিদ্রোহী না হয়ে—এই হল শ্রেয়ের পথ। তখন তুমি যা পাবে তাই তোমার পক্ষে যথোপযুক্ত হবে।

*
* *

শ্রদ্ধা, ভগবানের উপর নির্ভর, ভাগবত শক্তির কাছে সমর্পণ ও আত্মদান—এই সবই অবশ্য-প্রয়োজন, অপরিহার্য্য। কিন্তু ভগবানের উপর নির্ভর যেন আলস্য দুর্ব্বলতা বা নিম্নতন প্রকৃতির প্রবৃত্তির কাছে সমর্পণ, এ সকলের ছলমাত্র না হয়; নির্ভরের সাথে থাকবে অক্লান্ত আস্পৃহা আর সেই সাথে থাকবে ভাগবত সত্যের পথ প্রতিরোধ করে দাঁড়ায় যা-কিছু সে সমস্তের নিরন্তর প্রত্যাখ্যান। ভগবানের কাছে সমর্পণ যেন নিজেরই বাসনা ও নিম্নতন বৃত্তির কাছে অথবা নিজের অহংএর কাছে অথবা অজ্ঞানের ও তমিস্রার যে কোন শক্তি ভগবানের মিথ্যা রূপ গ্রহণ ক'রে আসে তার কাছে সমর্পণের ছল, আবরণ বা সুযোগে পরিণত করা না হয়

*
* *

তোমার কেবল দরকার আস্পৃহাপরায়ণ হওয়া, মায়ের দিকে নিজেকে খুলে রাখা, তাঁর ইচ্ছার বিরোধী যা-কিছু সব প্রত্যাখ্যান করা, তোমার ভিতরে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া—আর তুমি তোমার সব কাজ করবে তাঁরই জন্যে, এই স্থির বিশ্বাসে যে শুধু তাঁরই শক্তির কল্যাণে তোমার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব। এভাবে তুমি যদি নিজেকে উন্মুক্ত রাখতে পার, তা হলে যথাসময়ে জ্ঞান ও সিদ্ধি তোমার আসবেই।

*
* *

এ যোগে সব নির্ভর করে ভাগবত প্রভাবের কাছে তুমি নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে ধরতে পার কি না, তার উপর। আস্পৃহা যদি আন্তরিক হয়, সকল বাধা সত্ত্বেও ঊর্দ্ধতন চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যদি থাকে ধীর স্থির সঙ্কল্প, তবে সে উন্মুক্তি কোন না কোন রূপে আসবেই। কিন্তু তার জন্যে সময় বেশি লাগতে পারে, কমও লাগতে পারে—নির্ভর করে তোমার মন, হৃদয় ও দেহ প্রস্তুত হয়েছে কি প্রস্তুত হয় নাই তার উপর। সুতরাং যথেষ্ট ধৈর্য্য যদি না থাকে তা হলে আরম্ভে সাধনা এত দুরূহ বোধ হয় যে অনেকে সাধনা ছেড়েও দিতে পারে। এ যোগে কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি নাই—কেবল প্রয়োজন চেতনাকে একাগ্র করা, বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে, আর মায়ের অধিষ্ঠানকে ও শক্তিকে আহ্বান করা যাতে তিনি তোমার সত্তাটি আপন হাতে তুলে নেন এবং তার শক্তির ক্রিয়ার ফলে চেতনাকে রূপান্তরিত করেন। মস্তিষ্কে বা ভ্রূমধ্যেও চেতনাকে একাগ্র করা যায়—কিন্তু অনেকের পক্ষে উন্মুক্তির এ পথ অতি দুরূহ। মন যখন প্রশান্ত হয়, একাগ্রতা হয় দৃঢ় আর আস্পৃহা তীব্র তখনই অনুভূতির সূত্রপাত। শ্রদ্ধা যত বেশি হবে, তত ক্ষিপ্রতর ফললাভের সম্ভাবনা। শেষ কথা, কেবল নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে চললে হবে না, এ ছাড়াও ভগবানের সাথে একটা সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপন করতে পারা চাই, এবং মায়ের শক্তি ও অধিষ্ঠান ধারণ করবার সামর্থ্য অর্জ্জন করা চাই।

*
* *

তোমার প্রকৃতির মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হল মায়ের ক্রিয়াশক্তির দিকে নিজেকে খুলে রাখা। কোন সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজের চেষ্টায় কেউ নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে না ; এক ভাগবত শক্তিই এই রূপান্তর সাধন করতে পারে। তুমি যদি নিজেকে খুলে রাখতে পার,

তা হলে অবশিষ্ট যা দরকার তা সেই শক্তিই তোমার হয়ে ক'রে দিয়ে যাবে।

*
* *

কোন সাহায্য না নিয়ে, কেবল নিজের আস্পৃহা ও সঙ্কল্পের জোরে নিম্নতন প্রকৃতির বেগ জয় করতে পারে এমন শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। যারাও বা তা পারে, তারা শুধু কতকটা সংযম অর্জ্জন করে, পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নয়। স্থির সঙ্কল্প ও আস্পৃহা প্রয়োজন যাতে ভাগবতশক্তি তোমার সহায় হয়ে অবতরণ করতে পারে, আর যাতে সে শক্তি যখন নিম্নতন বৃত্তিসকলের উপর কাজ ক'রে চলে তখন সর্ব্বদা তার সপক্ষে থাকে তোমার সত্তাটি। কেবল ভাগবতশক্তিই অধ্যাত্ম সঙ্কল্পকে ও হৃদ্গত অন্তঃপুরুষের আস্পৃহাকে সার্থক ক'রে পূর্ণ বিজয় এনে দিতে পারে।

*
* *

মানব-প্রকৃতি বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির যে স্বাভাবিক ধারা তার বিপরীত দিকে যখন চলবার চেষ্টা করা হয়, তখন কেবল মানস সংযমের দ্বারা সে কাজ করা সর্ব্বদাই কঠিন। ধৈর্য্যের সাথে অধ্যবসায়ের সাথে যদি লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়সঙ্কল্পকে নিবদ্ধ রাখা যায় তবে তাতে একটা পরিবর্ত্তন সাধন হতে পারে বটে কিন্তু সাধারণতঃ তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং সফলতাও আরম্ভে কেবল আংশিক ও বহু বিফলতামিশ্রিত হওয়া সম্ভব।

কর্ম্ম-মাত্রই আপনা হতে আরাধনায় পরিণত হবে, এ কেবল চিন্তা-সংযম দিয়ে হয় না। এ জন্য প্রয়োজন হৃদয়ে এমন দৃঢ় আস্পৃহা যার ফলে যে অদ্বিতীয়ের উদ্দেশ্যে আরাধনা করা হয় তার জাগ্রত সান্নিধ্যের একটা কিছু উপলব্ধি বা অনুভূতি আসে। ভক্ত কেবল

নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার আরাধ্য ভগবানের করুণা ও শক্তির উপর।

*
* *

নিজের মনের ও ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়ার উপর বরাবর তুমি অত্যধিক নির্ভর ক'রে এসেছ, তাই তুমি সাধনায় অগ্রসর হতে পার না। তোমার চেষ্টাকে কেবল ধ'রে রাখবার জন্যে মায়ের শক্তিকে আহ্বান না ক'রে যদি মায়ের শক্তির উপর নীরবে নির্ভর করতে অভ্যস্ত হও, তবে বাধা হ্রাস হতে থাকবে, শেষে একেবারেই দূর হয়ে যাবে।

*
* *

অকপট ঐকান্তিক হলে ফলও অবশ্যম্ভাবী। যদি তুমি ঐকান্তিক হও, তবে দিব্য জীবনে তুমি গড়ে উঠবেই।

সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক হওয়া অর্থ কেবল ভাগবত সত্যকেই আকাঙ্ক্ষা করা, মা ভগবতীর কাছে উত্তরোত্তর আপনাকে সমর্পণ ক'রে দেওয়া, একমাত্র এই আস্পৃহা ব্যতীত আর সব ব্যক্তিগত দাবি বা আকাঙ্ক্ষা দূর করা, জীবনে প্রত্যেকটি কর্ম্ম ভগবানের কাছে উৎসর্গ করা, প্রত্যেকটি কর্ম্ম ভগবৎ-প্রদত্ত কর্ম্ম হিসাবে ক'রে যাওয়া, তার মধ্যে অহংকে টেনে না আনা। এই হল দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠা।

এ রকমটি একযোগে সম্পূর্ণভাবে হয়ে ওঠা যায় না। তবে নিরবচ্ছিন্ন আস্পৃহা যদি থাকে, যদি সত্যসন্ধ হৃদয় ও ঋজু সঙ্কল্প নিয়ে ভাগবতী শক্তিকে সাহায্যের জন্য নিরন্তর আহ্বান করা যায়, তবে উত্তরোত্তর এই চেতনায় গড়ে ওঠা যায়।

*
* *

এত অল্প সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সমর্পণ সম্ভব হয় না। কারণ, পরিপূর্ণ সমর্পণ অর্থ আধারের প্রতি অংশে রয়েছে যে অহংগ্রন্থি তা ছেদন করা, সমস্ত নির্মুক্ত ক'রে অখণ্ডভাবে ভগবানকে উৎসর্গ করা; মন প্রাণ শারীর-চেতনা (এমন কি তাদের প্রত্যেক অংশ এবং প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক বৃত্তি) একের পর একে পৃথক্ ভাবে আপনাদের সমর্পণ করবে, তাদের নিজস্ব ধারা পরিত্যাগ ক'রে গ্রহণ করবে ভগবানের ধারা। এতখানি সম্ভব না হলেও যা সম্ভব তা হল প্রথম হতে মূল চেতনার একটা সঙ্কল্প ও আত্মনিবেদন, আর প্রতিপদে আত্মদানকে সম্পূর্ণ করবার প্রত্যেক সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র তাকে ধ'রে যে দিকে পথ খোলা পাওয়া যায় সেই দিক দিয়ে ঐ মূল জিনিষটিকে বাস্তব ক'রে তোলা। একদিকের সমর্পণ অন্য একদিকের সমর্পণকে বেশি সহজ বেশি অবশ্যম্ভাবী ক'রে তোলে বটে, কিন্তু একদিকের সমর্পণ আপনা হতেই অন্যদিকের গ্রন্থি সব ছিন্ন করে বা শিথিল ক'রে দেয় না। বিশেষতঃ যে গ্রন্থিসমুদয় আমাদের বর্ত্তমান ব্যক্তিত্ব আর তার প্রিয়তম সৃষ্টি সকলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তারা—মূল সঙ্কল্পটি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হয়ে গেলে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ-সিদ্ধি আরম্ভ হলেও—অনেক সময়ে কঠিন বাধা নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

*
* *

যে দোষ হয়েছে বলে তুমি মনে করছ, জিজ্ঞাসা করছ তার প্রতিকার কি রকমে সম্ভব। তুমি যা বলছ ঘটনা তাই যদি হয়ে থাকে তবে তার প্রতিকার আমার মতে ঠিক এই:—ভাগবত সত্যের, ভাগবত প্রেমের আধাররূপে নিজেকে তৈরী করা। আর সেই উদ্দেশ্যে প্রথম ধাপ হল পূর্ণ আত্মনিবেদন ও আত্মশুদ্ধি, ভগবানের দিকে নিজেকে খুলে ধরা, সিদ্ধির পথে নিজের ভিতরে যা-কিছু

অন্তরায় তা বর্জ্জন করা। আধ্যাত্মিক জীবনে ভুলের আর কোন ক্ষতিপূরণ নাই, অন্ততঃ সম্পূর্ণ ফলপ্রদ আর কোন ক্ষতিপূরণ নাই। প্রথম প্রথম এই আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কোন লাভ বা ফল চাইতে হয় না, চাইলে বিষম হতাশ হতে হয়। নিজে মুক্ত হলে তবে অন্যকে মুক্ত করা যায়; আর এ যোগে আভ্যন্তরীণ বিজয় হতেই ফুটে ওঠে বাহ্য বিজয়।

*
* *

ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হঠাৎ একেবারেই দূর করা যায় না, আর তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ, তামসিক জড়তা অপেক্ষা ব্যক্তিগত চেষ্টা শ্রেয়।

ব্যক্তিগত চেষ্টাকে উত্তরোত্তর ভাগবত-শক্তির গতিপ্রবাহে পরিণত করতে হবে। ভাগবত ক্রিয়াশক্তির সজ্ঞান অনুভব যদি তোমার হয়ে থাকে, তবে তাকে আহ্বান কর যাতে সে উত্তরোত্তর তোমার মধ্যে বর্দ্ধিত হয়ে তোমার চেষ্টাকে পরিচালিত করে, আপনার মধ্যে তুলে ধরে, এমন একটা জিনিষে পরিণত করে যা তোমার নয়, যা হল মায়ের। ব্যক্তিগত আধারের মধ্যে ক্রিয়মাণ শক্তিরাজির হবে একটা ঊর্দ্ধায়ন, একটা যেন পারান্তর—এ পারান্তর হঠাৎ হয়ে পড়বে না, হবে ক্রমে ক্রমে।

কিন্তু প্রয়োজন অন্তঃপুরুষে স্থিতিলাভ—চাই সেই বিচারণার বিকাশ যা নির্ভুলে দেখে ভাগবত শক্তি কি, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই বা কতখানি, আর নিম্নতন বিশ্বশক্তিরাজি হতেই বা কি এসে ও-ত্রুটির সাথে মিশে যায়। ভগবানের হাতে যতদিন সম্পূর্ণভাবে ভার ন্যস্ত না করা হয়েছে—সকল ক্ষেত্রেই এর জন্য অবশ্য সময় দরকার—ততদিন সত্যশক্তিকে সর্ব্বদা স্বীকার করা, নিম্নতন মিশ্রশক্তিকে সর্ব্বদা প্রত্যাখ্যান করা, এই ব্যক্তিগত প্রয়াস থাকা চাই।

ব্যক্তিগত চেষ্টাকে বর্জ্জন করা বর্ত্তমানের প্রয়োজন নয়।

বর্ত্তমানে প্রয়োজন ভাগবত-শক্তিকে ক্রমেই বেশি ক'রে ডেকে আনা, তাকে দিয়ে ব্যক্তিগত প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করা।

*
* *

সাধনার প্রথম অবস্থায় ভগবানের উপর সব ছেড়ে দেওয়া কিম্বা নিজস্ব প্রয়াসের প্রয়োজন নাই বলে ভগবানের নিকট হতে সব প্রত্যাশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। ওরকম করা তখনই সম্ভব যখন অন্তঃপুরুষ সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, সমস্ত কর্ম্মের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে (তখনও তবু কিন্তু দরকার সতর্কতা, নিরন্তর সম্মতি-দান), আর তা হল সাধনার একেবারে শেষ অবস্থার কথা, যখন একটা সাক্ষাৎ বা প্রায় সাক্ষাৎ অতিমানস শক্তি চেতনাকে অধিকার করে—কিন্তু এ অবস্থা এখনও বহু দূরে। এ ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় উক্ত মনোভাব প্রায়ই জড়তা ও অচলতার দিকে নিয়ে যায়।

সত্তার যে সব অংশ কলের মত চলে কেবল তারাই নিজেদের অসহায় বলতে পারে, বিশেষতঃ শারীর (স্থূল-ভৌতিক) চেতনা স্বভাবতঃই জড়ধর্ম্মী, সে চালিত হয় এক মন ও প্রাণের দ্বারা অথবা ঊর্দ্ধতন শক্তিদের দ্বারা। তবে মানস সঙ্কল্পকে বা প্রাণের প্রবেগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করবার সামর্থ্য সকলেরই সর্ব্বাবস্থায় আছে। অবশ্য আশু ফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না—কারণ প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কিছুকালের জন্য—এমন কি হয়ত দীর্ঘকালের জন্য—নিম্নতন প্রকৃতির বাধা বা আসুর শক্তিদের আক্রমণ জয়ী হতে পারে। তখন সমানে যত্ন ক'রে চলতে হয়, সঙ্কল্পকে সর্ব্বদা ভগবানের স্বপক্ষে রাখতে হয় যা বর্জ্জনীয় তাকে বর্জ্জন করতে হয়, সত্যজ্যোতিঃ সত্যশক্তির দিকে আপনাকে উন্মুক্ত রাখতে হয়, শান্তভাবে, স্থিরভাবে, অশ্রান্তভাবে, অবসাদগ্রস্ত না হয়ে, ধৈর্য্য না হারিয়ে তাকে ডেকে নামিয়ে আনতে হয়, যে পর্য্যন্ত না অনুভব হয় ভাগবত শক্তি কাজ আরম্ভ করেছে, বাধা সব ক্রমে দূর হয়ে চলেছে।

তুমি বলছ তোমার অজ্ঞান ও তমোঘোর সম্বন্ধে তুমি সচেতন। কিন্তু এ যদি কেবল সাধারণভাবে ব্যাপক একটি চেতনা হয়, তবে তা যথেষ্ট নয়—প্রত্যেক বিশেষ বস্তুর মধ্যে, বাস্তবে ওদের কার্য্যধারার মধ্যেও যদি তুমি সচেতন হও, তবে তাই দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে বটে। যে সব ভ্রান্ত বৃত্তি সম্বন্ধে তুমি সচেতন তাদের দৃঢ়তার সাথে বর্জ্জন করতে হবে, তোমার মনকে প্রাণকে ভাগবত-শক্তির ক্রিয়ার জন্য প্রশান্ত ও নির্ম্মল ক্ষেত্র ক'রে তুলতে হবে।

*
* *

যে সকল বৃত্তি যন্ত্রবৎ চলে, মানস সঙ্কল্প দিয়ে তাদের বন্ধ করা সর্ব্বদাই অপেক্ষাকৃত দুরূহ; কারণ যুক্তি বা কোন ন্যায্য মানস-সমর্থনের উপর তারা আদৌ নির্ভর করে না, তারা হল একটা যোগাযোগের অথবা যন্ত্রবৎচালিত স্মৃতি ও অভ্যাসের ফল।

প্রত্যাখ্যানের সাধনা পরিণামে সফল হয় বটে, কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত চেষ্টায় তাতে সময় অনেক দরকার হতে পারে। তবে ভাগবত-শক্তি তোমার মধ্যে কাজ করছে এ অনুভব যদি তোমার হয়, তবে জিনিষটি সহজ হয়ে আসবার কথা।

এই দিশারী শক্তির কাছে তোমার যে আত্মদান তার মধ্যে জড় বা তামসিক কিছু যেন না থাকে; এ আত্মদানকে যেন প্রাণের কোথাও কোন অংশ নিম্নতর প্রেরণা ও বাসনার মন্ত্রণাকে প্রত্যাখ্যান না করবার সুযোগ ব'লে গ্রহণ না করে।

যোগসাধনা করবার সর্ব্বদা দুটি পথ আছে—এক, সজাগ মন ও প্রাণের ক্রিয়া, তার সহায়ে দেখা, পর্য্যবেক্ষণ করা, চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত করা কি কর্ত্তব্য আর কি অকর্ত্তব্য। অবশ্য এ ক্রিয়াটিরও পশ্চাতে রয়েছে ভাগবত-শক্তি, এখানেও আকর্ষণ করা হয়, আহ্বান করা হয় ভাগবত-শক্তিকেই—তা না হলে বেশি কিছু

করা সম্ভব নয়, তবুও এখানে ব্যক্তিগত চেষ্টাই প্রধান, একেই সাধনার ভার প্রায় সবখানি বহন করতে হয়।

অন্য পথটি হল অন্তঃপুরুষের পথ—এখানে চেতনা ভগবানের দিকে আপনাকে খুলে ধরে, কেবল অন্তঃপুরুষকেই সে যে খুলে ধরে, সম্মুখে নিয়ে আসে তা নয়, সেই সঙ্গে আবার মনকে প্রাণকে দেহকে খুলে ধরে, জ্যোতিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে, সাক্ষাৎ বোধ করে কি করতে হবে, অনুভব করে প্রত্যক্ষ করে ভাগবত-শক্তিই কাজ ক'রে চলেছে, আর নিজেও ভাগবত ক্রিয়াকে আহ্বান ক'রে, আপন সজাগ সচেতন সম্মতি দিয়ে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে চলছে।

সাধারণতঃ এ দুটি ধারায় মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী ততদিন যতদিন চেতনা সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উন্মুক্ত করবার জন্য তৈরী হয় নাই, তার সকল ক্রিয়ার উৎস হিসাবে ভাগবত অনুপ্রেরণার কাছে সম্পূর্ণ প্রণত হতে পারে নাই—এ অবস্থা হলে পরে সকল দায়িত্ব দূর হয়ে যায়, সাধককে নিজের ব্যক্তিগত ভার আর কিছু বহন করতে হয় না।

*
* *

তপস্যা দিয়ে হোক আর আত্মসমর্পণ দিয়ে হোক—তাতে কিছু এসে যায় না—একমাত্র কাজ হল লক্ষ্যের দিকে অটল হয়ে ফিরে দাঁড়ান। পথ যখন একবার ধরা হয়েছে, তখন তা ছেড়ে দিয়ে হীনতর কিছুর জন্য আবার পশ্চাৎপদ হওয়া কি ক'রে সম্ভব? সঙ্কল্প যদি দৃঢ় থাকে, তবে পতনে কিছু আসে যায় না—উঠে আবার চললেই হলো। লক্ষ্যের উপর যদি অটল নিষ্ঠা থাকে তবে ভাগবত সাধনার পথে পরিণামে কোন ব্যর্থতা আসতে পারে না। আর তোমাকে ক্রমাগতই সম্মুখে নিয়ে চলেছে এমন জিনিষ যদি কিছু তোমার ভিতর থাকে—সে জিনিষ নিশ্চয়ই তোমার আছে—তা হলে স্খলন পতন বা বিশ্বাসের বিচ্যুতি যত হোক পরিণামে তাতে কোন পার্থক্য ঘটায় না। দ্বন্দ্বের অবসান যতদিন না হয়,

আর ঋজু উন্মুক্ত নিষ্কণ্টক পথখানি না দেখা দেয়, ততদিন অধ্যবসায়ের সাথে লেগে থাকতে হয়।

*
* *

আগুনটি হল আস্পৃহার, আন্তর তপস্যার দিব্য অগ্নি। মানবীয় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঐ আগুন যখন বার বার ক্রমেই অধিকতর বেগে ও বৈপুল্যে অবতরণ করে, তখন প্রথমে মনে হয় অন্ধকারের মধ্যে সে বুঝি গ্রস্ত ও লুপ্ত হয়ে গেল; কিন্তু অবতরণের মাত্রা যত বেশি হবে, ততই সে অন্ধকারকে আলোকে, মানবমনের অজ্ঞান ও অচেতনাকে অধ্যাত্ম চেতনায় পরিবর্ত্তিত করে চলবে।

*
* *

সকল আসক্তি জয় করবার আর কেবল ভগবানেরই দিকে ফিরে দাঁড়াবার সঙ্কল্প যোগসাধনারই অঙ্গীভূত। সাধনার প্রধান কথা হল প্রতিপদে ভাগবত প্রসাদের উপর আস্থা রেখে, ভগবানের দিকে চিন্তাকে নিরন্তর প্রচালিত করে, আপনাকে উৎসর্গ করে চলা, যতদিন সত্তাটি খুলে না যায়, আর আধারের মধ্যে মায়ের শক্তি যে কাজ করছে তা অনুভব না হয়।

*
* *

এ যোগের সমস্ত মূল তত্ত্বটিই হল ভাগবত প্রভাবের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করা। ও-জিনিষটি রয়েছে ঠিক তোমার মাথার উপরেই; যদি তুমি তার সম্বন্ধে একবার সচেতন হতে পার, তখন তা হলে প্রয়োজন হবে তোমার ভিতরে তাকে আহ্বান করে নামিয়ে আনা। এ অবতরণ মনের মধ্যে হয়, দেহের মধ্যে হয় কখন শান্তিরূপে, কখন জ্যোতিরূপে, কখন ক্রিয়মাণ শক্তিরূপে, আবার সাকার কি নিরাকার ভগবৎ-অধিষ্ঠানরূপে কিম্বা আনন্দরূপে।

সে চেতনা যতদিন না হয়, ততদিন শ্রদ্ধা আর উন্মুক্তির জন্য আস্পৃহা নিয়ে থাকা দরকার। আস্পৃহা, আহ্বান, প্রার্থনা এক অভিন্ন জিনিষেরই নানা আকার, আর সবগুলিই ফলপ্রদ—যে আকার স্বতঃই তোমার আসে, বা তোমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ তাই গ্রহণ করবে। অন্য পথটি হল একাগ্রতা—চেতনাকে হৃদয়ে একাগ্র কর (কেউ কেউ করে মস্তকের মধ্যে বা উপরে), সেখানে মায়ের ধ্যান কর, সেখানেই তাঁকে ডেকে আন। এ দুটির যে-কোনটি করা যেতে পারে কিম্বা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করা যেতে পারে—যখন স্বভাবতঃই যা তোমার করা আসে, বা করতে প্রেরণা যায়। তবে আরম্ভে সবচেয়ে বিশেষ প্রয়োজন হল মনকে শান্ত করা, সাধনার সময়ে সাধনা-বহির্ভূত সব চিন্তা ও বৃত্তি দূর করা। শান্ত মনেই অনুভূতির জন্য অয়োজন উত্তরোত্তর সুষ্ঠু হয়ে চলে। কিন্তু সমস্ত কাজটি যদি একযোগে না হয়ে যায় তা হলে অধীর হয়ে পড়বে না। মনের মধ্যে পূর্ণ শান্তি নিয়ে আসা সময়-সাপেক্ষ —চেতনা যতদিন প্রস্তুত না হয় ততদিন অধ্যবসায়ের সাথে লেগে থাকতেই হবে।

*
* *

যোগ-সাধনার অভীষ্টলাভের একমাত্র উপায়, তোমার সত্তাকে মাতৃশক্তির কাছে উন্মুক্ত করা, সকল অহংকার দাবি বাসনা, শুধু ভাগবত সত্যের জন্য আস্পৃহা ব্যতিরেকে অন্য সব প্রেরণা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করা। এটি যথাযথ করা হলে, ভাগবত শক্তি ও জ্যোতি কাজ আরম্ভ করবে, যোগসিদ্ধির অবশ্য-প্রয়োজনীয় যে প্রতিষ্ঠা,— শান্তি ও সমতা, আন্তর সামর্থ্য, বিশুদ্ধ ভক্তি, ক্রমবর্দ্ধমান চেতনা ও আত্মজ্ঞান, এদের নিয়ে আসবে।

*
* *

তোমার পক্ষে সত্যটি হ'ল অন্তরে ভগবানকে অনুভব করা, মায়ের দিকে উন্মুক্ত হওয়া, ভগবানের জন্য কর্ম্ম করা যতদিন না যাবতীয় ক্রিয়ার মধ্যে মায়ের জ্ঞান তোমার হয়। তোমার হৃদয়ে থাকবে ভাগবত অধিষ্ঠানের চেতনা আর তোমার কর্ম্মে থাকবে ভাগবত নির্দ্দেশের চেতনা। এ জিনিষকে অন্তঃপুরুষ, যদি সে পূর্ণ জাগ্রত থাকে তবে, সহজে অবিলম্বে গভীর ভাবে অনুভব করতে পারে। আর অন্তঃপুরুষের একবার যদি এ অনুভব হয়ে থাকে তবে সে-অনুভব মনে ও প্রাণে পর্য্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

*
* *

তোমার অন্য যে অনুভবটি সে-সময়ের জন্য এত সত্য বলে মনে হয়েছিল তুমি বলছ, তার মধ্যে একমাত্র সত্য এই যে তোমার পক্ষে বা কারো পক্ষে তোমার বা তার শুধু নিজস্ব চেষ্টা দিয়ে নিম্নতন চেতনা হতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব; এই জন্যই যখন তুমি নিম্নতন চেতনার মধ্যে ডুবে যাও, সবই তোমার কাছে অসম্ভব বোধ হয়; কারণ সেই সময়ের জন্য তুমি সত্য চেতনাটি হারিয়ে ফেল। কিন্তু ও-ধারণা সত্য নয়, কারণ তোমার মধ্যে কোথাও কিছু ভগবানের দিকে খোলা রয়েছে, নিম্নতন চেতনার মধ্যে চিরকাল থেকে যেতে তুমি বাধ্য নও।

সত্য চেতনার মধ্যে যখন তুমি থাক তখন দেখতে পাও সবই করা সম্ভব—যদিও বর্ত্তমানে এ জিনিষের সামান্য আরম্ভ হয়েছে মাত্র; কিন্তু ভাগবত কর্ম্মবল, মাতৃশক্তি যদি সেখানে একবার এসে থাকে, তবে আরম্ভই যথেষ্ট। কারণ আসল সত্য হল এই যে এ শক্তি সবই করতে পারে—তবে অখণ্ড রূপান্তর আর অন্তঃপুরুষের পূর্ণ সার্থকতার জন্য প্রয়োজন সময় আর অন্তঃপুরুষের আস্পৃহা।

*
* *

মায়ের ইচ্ছা অনুসরণ করে চলতে হলে এই বিধিগুলি পালন করা চাই—(১) জ্যোতি, সত্য ও সামর্থ্যের জন্য তাঁরই দিকে ফিরে চাওয়া; (২) আর কোন শক্তি যেন তোমাকে প্রভাবিত ও চালিত না করে এই আস্পৃহা রাখা; (৩) প্রাণের কোন রকম দাবি বা নিজস্ব ব্যবস্থা না রাখা; (৪) মনকে এমন অচঞ্চল রাখা যাতে সে সত্যকে গ্রহণ করতে তৎপর থাকে অথচ নিজের ধারণা ও পরিকল্পনা সব জোর করে ধরে না থাকে; সর্ব্বশেষে, অন্তঃপুরুষকে জাগ্রত রাখা, সম্মুখে রাখা, যাতে মায়ের ইচ্ছার সাথে তোমার নিরন্তর যোগ থাকে আর তুমি সত্য সত্যই জানতে পাও তাঁর ইচ্ছা কি—অন্যরকম প্রেরণা ও মন্ত্রণাকে ভাগবত ইচ্ছা বলে মনে বা প্রাণে ভুল করতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরুষ একবার জাগ্রত হলে কখন ভুল করে না।

*
* *

কর্ম্মধারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে কেবল অতিমানস রূপান্তর সিদ্ধির পরে। তবে নিম্নতন স্তর-সমূহে একটা অপেক্ষাকৃত সুন্দর কর্ম্মধারা হওয়া সম্ভব, কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন, ভগবানের সাথে সংযোগ রাখা, আর মনে প্রাণে দেহে সতর্ক সজাগ সচেতন হওয়া। তা ছাড়া. পূর্ণমুক্তির জন্যও এ অবস্থাটি হল প্রথম আয়োজন ও অনিবার্য্য প্রয়োজন।

*
* *

বৈচিত্র্যহীনতাকে যে ভয় করে, চায় নূতন কিছু, তার পক্ষে যোগসাধনা করা সম্ভব নয়, অন্ততঃ এই যোগ—এ যোগে দরকার অফুরন্ত অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য। মৃত্যুভয়ও প্রাণে একটা দুর্ব্বলতার লক্ষণ, এও যোগ-সামর্থ্যের বিপরীত জিনিষ। তেমনি আবার, রিপুর যে একান্ত বশীভূত, তার পক্ষেও এ যোগ কঠিন বোধ হবে—এ রকম ক্ষেত্রে যদি অবলম্বন-স্বরূপ একটা ভিতরের যথার্থ ডাক না থাকে,

ভগবানের সাথে মিলনের জন্য এবং অধ্যাত্ম-চেতনা লাভের জন্য একটা আন্তরিক ও সুদৃঢ় আস্পৃহা না থাকে তবে সহজেই চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটতে পারে, সকল প্রয়াস একেবারেই নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে।

*
* *

কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে, সবই নির্ভর করে কথাটি বলতে তুমি কি বোঝ তার উপর। বাসনা প্রায়শঃ নিয়ে চলে অত্যধিক চেষ্টার দিকে—তার অর্থ অনেক শ্রম ও স্বল্প ফল, সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি অবসাদ এবং যেখানে বিপত্তি ও বিফলতা সেখানে হতাশা, অবিশ্বাস বা বিদ্রোহ; আর না হয়, তার লক্ষ্য হয় শক্তিকে জোর করে আকর্ষণ করা। শক্তিকে আকর্ষণ করা যায় বটে, কিন্তু কেবল যারা যোগে সমর্থ ও অভিজ্ঞ তাদের ছাড়া অন্যের পক্ষে তা নিরাপদ নয়,—যদিও এ উপায়ে অনেক সময়ে বিশেষ ফললাভ হয়ে থাকে তবুও—তা নিরাপদ নয়, প্রথমতঃ এই জন্য যে এতে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সব নিয়ে আসতে পারে, কিম্বা বিরোধী, ভ্রান্ত বা মিশ্র শক্তি সব নামিয়ে আনতে পারে—এগুলি সাধক যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাবে সত্য শক্তি থেকে পৃথক করে চিনতে পারে না; আর না হয়, ভগবানের অহেতুক দান ও সত্যকার নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে স্থান অধিকার করতে পারে একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণ শক্তি কিম্বা নিজের মানস বা প্রাণজ পরিকল্পনা। ক্ষেত্র বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব সাধনার ধারা। কিন্তু তোমার পক্ষে আমি যা শ্রেয় বিবেচনা করি তা হল আপনাকে নিরন্তর খুলে রাখা, আর ধীর স্থির আস্পৃহা, অতিরিক্ত উদ্‌গ্রীবতা নয়, পরন্তু একটা প্রফুল্লতা নির্ভর ও ধৈর্য্য।

*
* *

অতিমানস অধিকার করা হয়ে গেছে, না হোক অন্ততঃ তার আস্বাদ পেয়েছি এটুকুও, অকালে দাবি করা একান্ত দুর্ব্বুদ্ধিতার কাজ।

এ রকম দাবির সঙ্গে সঙ্গে থাকে অতি-অহংকারের আস্ফোট, দৃষ্টিভঙ্গির একটা প্রমাদ অথবা গুরুতর পতন, বিকৃত অবস্থা বা বিকৃত গতি। একটা আধ্যাত্মিক দীনতা, নিজেকে একটা অপ্রগল্‌ভ অনুদ্ধত দৃষ্টি দিয়ে দেখা, আপনার বর্ত্তমান প্রকৃতির ত্রুটিগুলি শান্তভাবে উপলব্ধি করা, এবং আত্মগরিমা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানের আত্মস্থিতিকে অতিক্রম করে উঠবার একান্ত প্রয়োজন অনুভব করা—তবে তা অহং-মুখী পদাকাঙ্ক্ষার জন্য নয়, পরন্তু ভগবৎমুখী আকৃতির জন্য—আমি মনে করি এ সবই হল অতিমানস রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভঙ্গুর পার্থিব মানব-আধারের পক্ষে বহুলগুণে শ্রেয়স্কর আশ্রয়।

*
* *

তোমার যে অনুভূতি আরম্ভ হয়েছে তা হল অন্তঃপুরুষের প্রভাবে দেহস্তরের আত্মসমর্পণ।

তোমার সব অঙ্গগুলি মূলতঃ সমর্পিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে এবং তাদের সকল ক্রিয়ার মধ্যে, সমগ্রভাবে ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, অন্তঃপুরুষভাবিত আত্মদান অনুশীলন করে সেই সমর্পণকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

ভগবানের ভোগ্য হওয়া অর্থ সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া,—তার ফলে অনুভব হয় যে ভগবৎ-অধিষ্ঠান, শক্তি, জ্যোতি, আনন্দই সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে রয়েছে, এ সকল জিনিষকে সাধক নিজে যে অধিকার করে রয়েছে তা নয়। নিজে অধিকারী হওয়া অপেক্ষা ভগবানের কাছে এইভাবে সমর্পিত ও ভগবান্ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার মধ্যে অনেক বেশি তীব্র আনন্দ। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমর্পণের ফলে আপন সত্তার ও প্রকৃতির উপর আসে একটা প্রশান্ত ও প্রসন্ন কর্ত্তৃত্ব।

*
* *

অন্তঃপুরুষকে সম্মুখে এনে ধর, সেখানে স্থায়ী করে রাখ—তার শক্তি মন প্রাণ দেহের উপর প্রয়োগ কর, যাতে এদের মধ্যে সে সংক্রামিত ক'রে দিতে পাবে তার নিজের অনন্যমুখী আস্পৃহার বল, তার নির্ভর, শ্রদ্ধা, সমর্পণ, আর দিতে পারে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু ভ্রান্ত, যা-কিছু অহংকারের ও প্রমাদের অভিমুখী এবং জ্যোতির ও সত্যের বিমুখী সে-সকলকে অচিরাৎ প্রত্যক্ষভাবে আবিষ্কার করবার ক্ষমতা।

যে কোন আকারেরই অহংকার হোক না তাকে উন্মূলিত কর, তোমার চেতনার প্রত্যেকটি ক্রিয়া হতে তাকে উন্মূলিত কর।

বিশ্বব্যাপী চেতনার অনুশীলন কর—বিস্তৃতির মধ্যে, নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে, আর বিশ্বভূত ভগবানের অনুভূতি, সার্ব্বভৌম শক্তিরাজির সাক্ষাৎ-প্রতীতি, বিশ্বপ্রকাশের—লীলার—উপলব্ধি ও অর্থবোধ, এ সকলের মধ্যে অহংপ্রতিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি লুপ্ত হয়ে যাক।

অহংএর পরিবর্ত্তে আবিষ্কার কর তোমার সেই সত্তা যা ভগবানের অংশ, জগন্মাতা হতে সঞ্জাত, লীলার যন্ত্র। তবে তুমি ভগবানের অংশ, তুমি যন্ত্র—এ অনুভবটিকে সকল গর্ব্ব, অহং-বোধ, অহংএর অধিকার, সকল শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, দাবি বা বাসনা হতে মুক্ত রাখতে হবে। কারণ এ সব জিনিষ সেখানে যদি থাকে তবে তা তোমার সত্য সত্তা নয়।

অধিকাংশ মানুষই যোগসাধনাকালে বাস করে মন-প্রাণ-দেহের মধ্যে—তবে এ মন-প্রাণ-দেহ কখন কখন বা কিছু পরিমাণে উর্দ্ধতর মন এবং জ্যোতির্ম্ময় মনের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু অতিমানস পরিবর্ত্তনটির জন্য প্রস্তুত হতে হলে দরকার (ব্যক্তিগতভাবে যার যখন সময় হয় তখনই) অন্তর্বোধি এবং অধিমানসের দিকে আত্মোন্মীলন, যাতে এ দুটি শক্তি সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে অতিমানস পরিবর্ত্তনের জন্য তৈরী করে তুলতে পারে। চেতনাকে শান্তভাবে বিকশিত ও বিস্তৃত হতে দাও, তা হলে এ সকল জ্ঞান ক্রমে অধিকতর পরিমাণে তোমার আসতে থাকবে।

স্থিরতা, বিচারণা, অনাসক্তি (কিন্তু ঔদাসীন্য নয়) এ সকলই অত্যন্ত-প্রয়োজনীয়, কারণ এদের বিপরীত যে সব জিনিষ তারা রূপান্তরের কাজে বিশেষ বাধা। আস্পৃহার তীব্রতা থাকা চাই—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে। ত্রস্ততা নয় জড়তাও নয়, রাজস অত্যুৎকণ্ঠাও নয়, আবার তামস হতাশাও নয়—থাকবে অটল অশ্রান্ত অথচ অচঞ্চল আবাহন ও অনুষ্ঠান। উপলব্ধি লাভের জন্য উদ্যতা বা আকুলতা নয়, প্রয়োজন উপলব্ধিকে ভিতর থেকে বা উপর থেকে আপনা হতে আসতে দেওয়া আর তার ক্ষেত্র, তার প্রকৃতি তার সামানা যথাবথ নিরীক্ষণ করা।

মায়ের শক্তিকে তোমার মধ্যে কাজ করতে দাও, কিন্তু সাবধান থেকো যেন কোন স্ফীত অহমিকার ক্রিয়া বা সত্যের ছদ্মবেশে কোন অজ্ঞানের শক্তি এসে তার স্থান গ্রহণ না ক'রে বসে বা তার সাথে মিশ্রিত না হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে এই আস্পৃহা রেখো যাতে তোমার প্রকৃতি হতে সকল তমিস্রা, সকল অচেতনা বহিষ্কৃত হয়।

অতিমানস পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হতে হলে এইগুলি হল তার অবশ্য-পালনীয় মুখ্য বিধান। এদের কোনটিই সহজ নয়, সবগুলি সম্পূর্ণ সিদ্ধ হলে তবে বলা চলে যে প্রকৃতি প্রস্তুত হয়েছে, তার পূর্ব্বে নয়। যদি যথার্থ মূল ভাবটি প্রতিষ্ঠিত করা যায় (তা হল অন্তরাত্মার বস্তু, অহংকার-বর্জ্জিত, কেবল ভাগবতী শক্তির দিকেই উন্মীলিত), তবে সাধনার কাজ দ্রুত চলতে থাকে। এই সত্যকার মূলভাবটি গ্রহণ করা, তাকে ধারণ করা, নিজের মধ্যে পরিবর্ত্তনকে বর্দ্ধিত করা,—এ কাজ করাই হল সাধকের দিক থেকে যথাসাধ্য সাহায্য করা, আর একটা সার্ব্বজনীন পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য এই সাহায্যের বেশি কিছু সাধকের নিকট থেকে চাওয়া হয় না।

বাধাবিঘ্ন

প্রথম অবস্থায় সর্ব্বদাই অনেক বাধা আসে, উন্নতির পথেও বহু বিঘ্ন ঘটে—আধার যতদিন প্রস্তুত না হয়ে ওঠে ততদিন ভিতরের দুয়ার সব খুলতেও বিলম্ব হয়। তবে যখন তুমি ধ্যান কর তখনই যদি প্রশান্তি ও অন্তর্জ্যোতির স্ফুরণ অনুভব কর, আর অন্তর্মুখী গতি যদি এতখানি প্রবল হয়ে ওঠে যে বাহিরের প্রভাব হ্রাস হয়ে চলে এবং প্রাণের বিক্ষোভও ক্ষীণবল হয়ে আসে, তা হলে এতেই বুঝতে হবে তোমার অনেকখানি উন্নতি ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। সাধনার পথ সুদীর্ঘ, বহুল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে প্রত্যেক অঙ্গুলিপ্রমাণভূমি জয় করে চলতে হবে—তাই সকলের উপরে যে গুণটি সাধকের থাকা দরকার তা হল ধৈর্য্য এবং একনিষ্ঠ অধ্যবসায়, আর সেই সাথে এমন শ্রদ্ধা যা সকল বিঘ্নের, কালবিলম্বের, আপাতদৃষ্ট ব্যর্থতার ভিতরে রয়েছে অটল।

*
* *

সাধনায় প্রথম প্রথম এ সকল বাধা সচরাচর ঘটে থাকে। স্বভাব যথেষ্ট গ্রহণ-সমর্থ হয়ে ওঠে নাই বলে এ সবের উৎপত্তি। কোথায় তোমার বাধাটি খুঁজে বের করা উচিত, মনে না প্রাণে, সেখানে চেতনাকে বিস্তৃত করে ধরবার চেষ্টা করবে, শুদ্ধি ও শান্তিকে বেশি করে ডেকে আনতে হবে, আর ঐ শুদ্ধি ও শান্তির মধ্যে তোমার সত্তার সেই দুর্ব্বল অঙ্গটি ভাগবতী শক্তির কাছে ঐকান্তিকভাবে অখণ্ডভাবে উৎসর্গ করবে।

*
* *

স্থিরতা, বিচারণা, অনাসক্তি (কিন্তু ঔদাসীন্য নয়) এ সকলই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এদের বিপরীত যে সব জিনিষ তারা রূপান্তরের কাজে বিশেষ বাধা। আস্পৃহার তীব্রতা থাকা চাই—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে। ত্রস্ততা নয় জড়তাও নয়, রাজস অত্যুৎকণ্ঠাও নয়, আবার তামস হতাশাও নয়—থাকবে অটল অশ্রান্ত অথচ অচঞ্চল আবাহন ও অনুষ্ঠান। উপলব্ধি লাভের জন্য উদ্যতা বা আকুলতা নয়, প্রয়োজন উপলব্ধিকে ভিতর থেকে বা উপর থেকে আপনা হতে আসতে দেওয়া আর তার ক্ষেত্র, তার প্রকৃতি তার সামানা যথাযথ নিরীক্ষণ করা।

মায়ের শক্তিকে তোমার মধ্যে কাজ করতে দাও, কিন্তু সাবধান থেকো যেন কোন স্ফীত অহমিকার ক্রিয়া বা সত্যের ছদ্মবেশে কোন অজ্ঞানের শক্তি এসে তার স্থান গ্রহণ না ক'রে বসে বা তার সাথে মিশ্রিত না হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে এই আস্পৃহা রেখো যাতে তোমার প্রকৃতি হতে সকল তমিস্রা, সকল অচেতনা বহিষ্কৃত হয়।

অতিমানস পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হতে হলে এইগুলি হল তার অবশ্য-পালনীয় মুখ্য বিধান। এদের কোনটিই সহজ নয়, সবগুলি সম্পূর্ণ সিদ্ধ হলে তবে বলা চলে যে প্রকৃতি প্রস্তুত হয়েছে, তার পূর্ব্বে নয়। যদি যথার্থ মূল ভাবটি প্রতিষ্ঠিত করা যায় (তা হল অন্তরাত্মার বস্তু, অহংকার-বর্জ্জিত, কেবল ভাগবতী শক্তির দিকেই উন্মীলিত), তবে সাধনার কাজ দ্রুত চলতে থাকে। এই সত্যকার মূলভাবটি গ্রহণ করা, তাকে ধারণ করা, নিজের মধ্যে পরিবর্ত্তনকে বর্দ্ধিত করা,—এ কাজ করাই হল সাধকের দিক থেকে যথাসাধ্য সাহায্য করা, আর একটা সার্ব্বজনীন পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য এই সাহায্যের বেশি কিছু সাধকের নিকট থেকে চাওয়া হয় না।

বাধাবিঘ্ন

প্রথম অবস্থায় সর্ব্বদাই অনেক বাধা আসে, উন্নতির পথেও বহু বিঘ্ন ঘটে—আধার যতদিন প্রস্তুত না হয়ে ওঠে ততদিন ভিতরের দুয়ার সব খুলতেও বিলম্ব হয়। তবে যখন তুমি ধ্যান কর তখনই যদি প্রশান্তি ও অন্তর্জ্যোতির স্ফুরণ অনুভব কর, আর অন্তর্মুখী গতি যদি এতখানি প্রবল হয়ে ওঠে যে বাহিরের প্রভাব হ্রাস হয়ে চলে এবং প্রাণের বিক্ষোভও ক্ষীণবল হয়ে আসে, তা হলে এতেই বুঝতে হবে তোমার অনেকখানি উন্নতি ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। সাধনার পথ সুদীর্ঘ, বহুল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে প্রত্যেক অঙ্গুলিপ্রমাণভূমি জয় করে চলতে হবে—তাই সকলের উপরে যে গুণটি সাধকের থাকা দরকার তা হল ধৈর্য্য এবং একনিষ্ঠ অধ্যবসায়, আর সেই সাথে এমন শ্রদ্ধা যা সকল বিঘ্নের, কালবিলম্বের, আপাতদৃষ্ট ব্যর্থতার ভিতরে রয়েছে অটল।

*
* *

সাধনায় প্রথম প্রথম এ সকল বাধা সচরাচর ঘটে থাকে। স্বভাব যথেষ্ট গ্রহণ-সমর্থ হয়ে ওঠে নাই বলে এ সবের উৎপত্তি। কোথায় তোমার বাধাটি খুঁজে বের করা উচিত, মনে না প্রাণে, সেখানে চেতনাকে বিস্তৃত করে ধরবার চেষ্টা করবে, শুদ্ধি ও শান্তিকে বেশি করে ডেকে আনতে হবে, আর ঐ শুদ্ধি ও শান্তির মধ্যে তোমার সত্তার সেই দুর্ব্বল অঙ্গটি ভাগবতী শক্তির কাছে ঐকান্তিকভাবে অখণ্ডভাবে উৎসর্গ করবে।

*
* *

স্বভাবের প্রত্যেক অঙ্গ তার পুরাতন ধারায় বরাবর চলতে চায়, আর যতদূর পারে আমূল কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি ঘটতে দিতে চায় না; কারণ তা হলে যে তাকে নিজের চেয়ে ঊর্দ্ধতর কিছুর অনুগত হতে হয়, নিজের ক্ষেত্রে, নিজের পৃথক্ সাম্রাজ্যে তার অবাধ প্রভুত্ব হতে বঞ্চিত হতে হয়। এইজন্যেই রূপান্তরের সাধনা এত দীর্ঘ ও দুরূহ হয়ে থাকে।

মন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, কারণ মনের নীচের দিকের ভিত্তি হল, তমঃ বা জড়ত্ব ধর্ম্ম যার, সেই দেহজ মন। স্থূল-ভূতের জড়ত্বই মূল ধর্ম্ম। ঊর্দ্ধতর অনুভূতি যদি টানা-ধারায় বেশি সময় চলে, তাতে মন অবসন্ন হতে থাকে, এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে একটা অস্বস্তি বা নিস্তেজতা এসে দেখা দেয়। তবে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা বা সমাধি এ রকম পরিণাম থেকে নিষ্কৃতির এক উপায়—এখানে শরীরকে শান্ত করা হয়, দেহজ মন থাকে একটা আচ্ছন্ন অবস্থায়, ভিতরের চেতনা তখন যথেচ্ছ নিজের অনুভূতি উপলব্ধি নিয়ে চলতে থাকে। অসুবিধা এই যে সমাধি অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়ায়—জাগ্রত চেতনার সমস্যার সমাধান হয় না; সেখানে ত্রুটি থেকে যায়।

*

* *

ধ্যানের সময় বাধা যদি এই হয় যে যত রাজ্যের চিন্তা এসে জুটতে থাকে, তবে সেটি দুষ্টশক্তির জন্য নয়, তার কারণ মানব মনের সাধারণ স্বভাব। সকল সাধকেরই এই বাধা আছে এবং অনেকের তা আবার দীর্ঘকাল ধরে থাকে। একে দূর করবার কয়েকটি উপায় আছে। একটি হল চিন্তাগুলির উপর দৃষ্টি দেওয়া, তাতে মানব মনের কি ধরণের প্রকৃতি প্রকাশ পায় তা নিরীক্ষণ করা—নিরীক্ষণ করা কিন্তু তাতে কোন সম্মতি না দেওয়া—কেবল চলতে দেওয়া যে পর্য্যন্ত তারা ক্ষীণ হয়ে হয়ে না থেমে যায়—বিবেকানন্দ তাঁর রাজযোগে এই এক পন্থা অনুমোদন করেছেন। আর এক হল চিন্তাগুলি

দেখে যাওয়া যেন তারা তোমার নিজের নয়, নিজে সাক্ষীপুরুষরূপে পিছনে সরে দাঁড়ান, কিছুতেই অনুমতি না দেওয়া, চিন্তাগুলিকে দেখা যেন তারা বাহির হতে, প্রকৃতি হতে আসছে, অনুভব করা তারা যেন পথচারী মাত্র, মনের আকাশ পার হয়ে চলেছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তাদের বিষয়ে তোমার কোন ঔৎসুক্য নাই। এ রকমে চললে শেষে দেখা যায় যে মন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে—একটি হল মনোময় সাক্ষীপুরুষ, যে কেবল দেখে যায়, থাকে নির্ব্বিচল প্রশান্ত; আর একটি হল যা দৃষ্টির বিষয়, প্রকৃতির ভাগ, যার মধ্যে চিন্তা সব গতায়াত করে, বিচরণ করে। পরে আরও অগ্রসর হয়ে প্রকৃতি-অংশটুকুও নিস্তব্ধ বা শান্ত করার উদ্যোগ করা যেতে পারে। একটি তৃতীয় পন্থাও আছে, এক সক্রিয় পদ্ধতি—এখানে দেখতে চেষ্টা করা হয় চিন্তা সব আসে কোথা হতে, পরে দেখা যায় তারা সাধকের নিজের ভিতর থেকে আসে না, আসে যেন মাথার বাহির থেকে; যখন তারা আসছে তখন যদি তাদের ধরা যায়, তবে ভিতরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই তাদের দূরে ফেলে দিতে হয়। এ পথটি বোধ হয় সব চেয়ে দুরূহ, আর সকলেরই সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু যদি আয়ত্ত হয়, তবে নীরবতা লাভের এর অপেক্ষা ক্ষিপ্র ও অব্যর্থ উপায় আর নাই।

*
* *

তোমার মধ্যে যে সব ভুল-বৃত্তি সেগুলি লক্ষ্য করা ও জানা দরকার —তারাই হল তোমার দুর্ভোগের মূল, যদি মুক্ত হতে চাও তবে ক্রমাগত তাদের প্রত্যাখ্যান করে চলতে হবে।

কিন্তু তাই বলে সদা-সর্ব্বদা তোমার ত্রুটি ও ভুল-বৃত্তির কথা কেবল চিন্তা করবে না। বরং তোমাকে যা হতে হবে, তোমার যা আদর্শ তারই উপর বেশি ধ্যান দাও, আর এই শ্রদ্ধা রেখ যে তাই যখন তোমার লক্ষ্য তখন তাতে সিদ্ধ হতে হবে,—সিদ্ধি হবেই।

সদা-সর্ব্বদা কেবল দোষ ভুল-বৃত্তি দেখে চললে অবসাদ এসে পড়ে, শ্রদ্ধা দুর্ব্বল হতে থাকে। উপস্থিত কোন অন্ধকারের পরিবর্ত্তে দৃষ্টি বরং নিবদ্ধ কর উদীয়মান আলোকের দিকে। শ্রদ্ধা, প্রফুল্লতা, পরিণামে বিজয়ের নিশ্চয়তা—এই সব জিনিষই সহায়, এই সবই অগ্রগতিকে সহজ ও ক্ষিপ্র করে তোলে।

উৎকৃষ্ট যে সকল অনুভূতি তোমার হয়, তারই উপর বেশি জোর দাও। এ ধরণের একটি অনুভূতি সকল বিচ্যুতি বিফলতার অপেক্ষা মূল্যবান—তা'ও যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন অনুতাপ করবে না, হতাশ হয়ে পড়বে না, ভিতরে প্রশান্ত থাকবে, আস্পৃহা রাখবে যাতে অনুভূতিটি দৃঢ়তর রূপ নিয়ে ফিরে আসে, আরও গভীরতর পূর্ণতর অনুভূতির দিকে নিয়ে যায়।

আস্পৃহা সদা-সর্ব্বদা রাখবে, তবে অধিকতর প্রশান্তির সাথে আর ভগবানের কাছে নিজেকে সহজভাবে অখণ্ডভাবে উন্মীলিত ক'রে।

*
* *

নিম্নতর প্রাণটি প্রায় সব মানুষের মধ্যেই দারুণ ত্রুটিতে, আর যে-সব বৃত্তি দুষ্টশক্তিদের কথায় সাড়া দেয় তাতে পরিপূর্ণ। অন্তঃপুরুষের নিরবচ্ছিন্ন উন্মীলন, এই সব প্রভাবের নিরন্তর প্রত্যাখ্যান, দুষ্টশক্তির সকল প্রকার মন্ত্রণা থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখা, আর ভিতরে মাতৃশক্তির স্থিরতা জ্যোতি শান্তি শুদ্ধির অবতরণ—এতেই আধার তার অবরোধ থেকে পরিণামে মুক্ত হয়ে উঠবে।

দরকার হল শান্ত থাকা, ক্রমেই বেশি শান্ত থাকা,—এ সকল প্রভাবকে দেখা যে তারা তোমার কিছু নয়, তারা অনধিকার প্রবেশ করেছে, এদের থেকে নিজেকে পৃথক করে ধরা, এদের অস্বীকার করা, প্রশান্ত আস্থা নিয়ে ভাগবতী শক্তির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা। তোমার অন্তঃপুরুষ যদি ভগবানকে কামনা করে, আর তোমার মন যদি অকপট হয় এবং নিম্নতন প্রকৃতি হতে, সকল দুষ্টশক্তি হতে মুক্তি

ভিক্ষা করে, আর তুমি যদি তোমার হৃদয়ের মধ্যে মাতৃশক্তিকে অহ্বান করে আনতে পার এবং নিজের শক্তির অপেক্ষা তারই উপর বেশি নির্ভর করতে পার, তবে পরিণামে আধারের এই অবরোধ দূরীভূত হবে, আর তার স্থান অধিকার করবে শান্তি ও সামর্থ্য।

*
* *

নিম্নতন প্রকৃতি হল অজ্ঞ ও অদিব্য—সে যে স্বভাবতঃই জ্যোতির ও সত্যের বিরোধী তা নয়, তবে ওদিকটি তার অবরুদ্ধ। দুষ্টশক্তি হল তারা যারা দিব্যের বিরোধী, কেবল যে দিব্যের অভাব তাদের মধ্যে, এমন নয়। তারা নিম্নতন প্রকৃতিকে আপনার কাজে ব্যবহার করে, কলুষিত করে, বিকৃত বৃত্তি সব দিয়ে ভরে তোলে—এই উপায়ে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এমন কি তার ভিতরে প্রবেশ করবার, তাকে অধিকার করবার, অন্ততঃ তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করবার চেষ্টা করে।

সকল প্রকার অতিরিক্ত আত্ম-অনাদর হতে, পাপে বাধার ব্যর্থতার বোধ হেতু অবসাদগ্রস্ত হবার অভ্যাস হতে আপনাকে মুক্ত কর। এ সকল ভাব সত্যই সহায় নয়, পরন্তু বিষম অন্তরায়, তারা অগ্রগতিকে ব্যাহত করে; তারা সাধু মনোভাবের পর্য্যায়ে হতে পারে, যোগী মনোভাবের পর্য্যায়ে নয়। যোগী প্রকৃতির সকল ত্রুটিকে দেখবে, নিম্নতন প্রকৃতির সর্ব্বসাধারণ বৃত্তি হিসাবে—এ সব সে প্রত্যাখ্যান করবে স্থিরভাবে, দৃঢ়ভাবে, নিরন্তরভাবে, ভাগবতী শক্তির উপর পূর্ণ আস্থা রেখে—তাতে কোন দুর্ব্বলতা, অবসাদ, অবহেলা কিম্বা উত্তেজনা, অধৈর্য্য বা উগ্রতা তার থাকবে না।

*
* *

সাধনার নিয়ম হল অবসাদে অবসন্ন না হয়ে পড়া, তা থেকে নিজেকে সরিয়ে ধরা, তার হেতু লক্ষ্য করা ও হেতুটি দূর করা। কারণ, হেতুটি

সর্ব্বদাই নিজের মধ্যে, হয়ত প্রাণের কোথাও কিছু ত্রুটি রয়েছে, একটা দুষ্প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে অথবা কোন ক্ষুদ্র বাসনা কখন বা ভোগের ফলে, কখন বা বঞ্চিত হওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে —সাধনায় বঞ্চিত বাসনা অপেক্ষা যে বাসনা চরিতার্থ করা হয়েছে, যে দুষ্প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাতে বেশি খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটে।

এ সব স্পর্শ অবাধে গিয়ে পৌঁছায় যে বাহ্য প্রাণে ও মনে সেখানে নয়, আরও গভীরতর ভিতরে গিয়ে অবস্থান করা হল তোমার প্রয়োজন। অন্তরতম অন্তঃপুরুষটি এ সবে পীড়িত হয় না, ভগবানের সাথে আপন অন্তরঙ্গতায় সে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষুদ্র বাহ্য বৃত্তি-সব সে বাহ্য জিনিষ হিসাবে দেখে, তার সত্য ভাগবত-সত্তার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নাই।

*
* *

তোমার যে সব বাধা এবং যে সব দুষ্প্রবৃত্তি তোমাকে আক্রমণ করে তাদের নিয়ে যখন তুমি ব্যাপৃত তখন হয়ত একটি ভুল তুমি কর, তাদের সাথে নিজেকে এক করে ফেল, তোমার নিজের প্রকৃতির অঙ্গ বলে তাদের মনে কর। তা না করে তোমার উচিত ও-সব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা, নির্ম্মুক্ত ও নির্লিপ্ত করা, মনে করা ও-সব হল অপূর্ণ ও অশুদ্ধ যে বিশ্বজনীন নিম্নপ্রকৃতি তার ক্রিয়া, ওরা এমন সব শক্তিধারা যারা তোমার ভিতরে প্রবেশ ক'রে, তোমাকে তাদের আত্মপ্রকাশের যন্ত্র ক'রে তুলবার চেষ্টা করে। কিন্তু তুমি যদি এ রকমে নিজেকে নির্ম্মুক্ত ও নির্লিপ্ত করে ধর, তা হলে তোমার পক্ষে তোমার নিজের এমন একটি অঙ্গ আবিষ্কার করবার এবং তার মধ্যে অধিকতর স্থিতি লাভ করবার বেশি সম্ভাবনা হবে যেটি হল তোমার অন্তরের সত্তা, তোমার অন্তঃপুরুষ—এ সত্তাটি ও-সকল বৃত্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় না, উদ্ব্যস্ত হয় না, দেখতে পায় তারা রয়েছে তার সম্পূর্ণ বাহিরে, তাদের খেলায় সম্মতি দিতে সহজ প্রেরণাবশেই

অস্বীকার করে, অনুভব করে সদাসর্ব্বদাই ভাগবত শক্তিরাজির দিকে এবং চেতনার ঊর্দ্ধতর ক্ষেত্রসকলের দিকে তার দৃষ্টি রয়েছে, সংযোগ রয়েছে। তোমার সত্তার এই অংশটি আবিষ্কার করে তার মধ্যে বাস কর—এ কাজটি করতে পারাই যোগসাধনার সত্যপ্রতিষ্ঠা।

এ ভাবে যদি সরে দাঁড়াতে পার, তা হলে বাহ্যিক দ্বন্দ্বের পিছনে, তোমার অন্তরে এমন এক প্রশান্ত স্থিতি তুমি অপেক্ষাকৃত সহজে লাভ করতে পারবে যেখান থেকে মুক্তির জন্য ভগবৎ সাহায্যকে আহ্বান করা তোমার বেশি ফলপ্রদ হবে। ভাগবত-অধিষ্ঠান স্থিরতা, শান্তি, শুদ্ধি, শক্তি, জ্যোতি, আনন্দ, প্রসারতা তোমার ঊর্দ্ধেই রয়েছে, তোমার মধ্যে অবতরণের অপেক্ষা করছে। এই পিছনের প্রশান্তিকে লাভ কর, তা হলে তোমার মনও প্রশান্ততর হবে, আর প্রশান্ত মনের ভিতর দিয়ে প্রথমে শুদ্ধিকে ও শান্তিকে, পরে ভাগবত ক্রিয়াশক্তিকে ডেকে নামাতে পারবে। যদি তোমার মধ্যে এই শান্তি ও শুদ্ধির অবতরণ তুমি অনুভব করতে পার, তা হলে তুমি তাকে বার বার ডেকে নামাতে পার, যে পর্য্যন্ত না সে স্থির-প্রতিষ্ঠ হতে আরম্ভ করে। তুমি আরও অনুভব করবে যে ভাগবত ক্রিয়াশক্তি তোমার বৃত্তিসকলের পরিবর্ত্তনের জন্য, চেতনার রূপান্তরের জন্য তোমার মধ্যে কাজ করে চলেছে। এই কর্ম্মধারারই মধ্যে মায়ের সত্তা ও শক্তি সম্বন্ধে তুমি সচেতন হয়ে উঠবে। একবার এ কাজটি যদি হয়ে যায়, তা হলে অবশিষ্টের জন্য প্রয়োজন কেবল সময় আর তোমার ভিতরে তোমার সত্য ও ভাগবত প্রকৃতির ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশ।

*
* *

স্বভাবের ত্রুটি, এমন কি বহুল ও বিষম ত্রুটি সব থাকলেও, এ যোগে উন্নতির পক্ষে তা যে স্থায়ী অনধিকারের কারণ তা নয়। (আমি বলছি না পূর্ব্বে যে আত্মোন্মীলন ঘটেছিল তার পুনরাবির্ভাব হবে—

কারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতা হতে আমি দেখেছি যে একটা অবরুদ্ধ বা দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থার পরে আসে একটা নূতন ও বৃহত্তর উন্মীলন, একটা প্রশস্ততর চেতনা এবং আগে যা লাভ হয়েছিল এবং সে-সময়ের জন্য যা হারিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল শুধু—তা অতিক্রম করে আর এক ধাপ অগ্রগতি।) একমাত্র যে-বস্তু স্থায়ী অনধিকারের কারণ হতে পারে—কিন্তু হবেই যে তা নয়, এরও পরিবর্ত্তন সম্ভব—তা হল আন্তরিকতার অভাব—এ জিনিষটি তোমার মধ্যে নাই। ত্রুটি থাকা অর্থ যদি হয় অনধিকার, তা হলে যোগসাধনায় কেহই সফল হতে পারত না। কারণ ত্রুটি সকলেরই আছে, আর আমি যতদূর দেখেছি তা থেকে এমন কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি না যে যোগসাধনার জন্য যাদের সবচেয়ে বেশি সামর্থ্য ঠিক তাদেরই প্রায়শঃ সবচেয়ে বেশি ত্রুটি থাকে না। হয়ত তুমি জান সোক্রাতা তাঁর নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছিলেন—সে কথা বহু মহাযোগী তাঁদের নিজেদেরও যে সাধারণ মানবপ্রকৃতি নিয়ে আরম্ভ করতে বাধ্য হন তার সম্বন্ধে বলতে পারেন। যোগসাধনায় পরিণামে যে জিনিষটি কাজ দেয় তা হল আন্তরিকতা, আর সেই সঙ্গে পথে লেগে থাকার ধৈর্য্য। তবে এমনও অনেকে আছে যারা এই ধৈর্য্য ব্যতিরেকেও লক্ষ্যস্থানে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়; কারণ বিদ্রোহ, অধৈর্য্য অবসাদ, নিরাশা, ক্লান্তি, সাময়িক শ্রদ্ধাহানি, এসকল জিনিষ সত্ত্বেও বাহ্য সত্তার চেয়ে মহত্তর শক্তি, অধ্যাত্মপুরুষের শক্তি, অন্তরাত্মার প্রয়োজনের প্রবেগ সকল ঘনঘটা ও কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়ে লক্ষ্যের অভিমুখে তাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। ত্রুটি বিঘ্ন হতে পারে, সাময়িক একটা খারাপ ধরণের পতনও ঘটাতে পারে, কিন্তু স্থায়ী অনধিকার তাতে আসে না। স্বভাবের মধ্যে কোন বাধার ফলে যে অপ্রকাশ, বিলম্বের সে এক গুরুতর কারণ হতে পারে—কিন্তু তাও চিরকাল থাকে না।

তোমার জড় অবস্থা দীর্ঘকালব্যাপী হলেও, তা তোমার সামর্থ্যে, তোমার আধ্যাত্মিক ভবিতব্যে আস্থা হারাবার যথেষ্ট কারণ নয়। আমার

মনে হয় পর্য্যায়ক্রমে আলোর ও আঁধারের অবস্থা যোগীদের সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা—তার ব্যতিক্রম অত্যন্ত বিরল। এই যে ব্যাপারটি আমাদের অধীর মানব প্রকৃতির কাছে একান্ত অপ্রিয়, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সে কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ জ্যোতি বা শক্তি বা আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন অবতরণ মানব চেতনা ধারণ করতে পারে না কিম্বা হঠাৎ গ্রহণ করতে ও আপনার করে নিতে পারে না। পরিপাকের জন্য মাঝে মাঝে তার সময় দরকার, তবে এই পরিপাক বাহ্য-চেতনার আবরণের অন্তরালে চলতে থাকে, যে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি নেমে এসেছে তা আবরণের অন্তরালে ডুবে যায়, আর এই বাহিরের বা উপর-উপর কার চেতনাটি শূন্য পড়ে থাকে ও নূতন অবতরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। সাধনার যখন অধিকতর পরিণত অবস্থা তখন এই আঁধারের বা জড়তার পর্ব্ব সব ক্রমে স্বল্পকাল স্থায়ী হয়, কম কষ্টকর হয়, আর তার সঙ্গেই একটা বৃহত্তর চেতনার কল্যাণে থাকে উন্নতির বোধ, কারণ সে-চেতনা অব্যবহিত অগ্রগতির জন্য কাজ না করলেও তা সেখানে বর্ত্তমান রয়েছে, সে'ই বাহ্য প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। দ্বিতীয় কারণ হল কোন ভিতরের বাধা, মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু যা পূর্ব্বতন অবতরণকে অনুভবই করে নাই, যা প্রস্তুত হয় নাই, হয়ত পরিবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ—সে জিনিষটি হল অনেক সময়ে মনের বা প্রাণের একটা সুদৃঢ় অভ্যাসগত বৃত্তি কিম্বা শারীর চেতনার সাময়িক জড়তা মাত্র, কিন্তু প্রকৃতির ঠিক অঙ্গীভূত নয়—ঐ জিনিষটিই তা ব্যক্ত হোক কি গুপ্ত হোক বিঘ্নকে নিয়ে আসে। কিন্তু যদি নিজের ভিতরে কারণটি ধরতে পারা যায়, স্বীকার করা যায়, তার ক্রিয়া পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়, তাকে দূর করবার জন্য ভাগবত শক্তিকে অহ্বান করা যায়, তা হলে তামস পর্ব্বগুলি অনেকখানি খর্ব্ব করে আনা যায়, তাদের উগ্রতারও হ্রাস হয়। কিন্তু সে যা হোক সকল ক্ষেত্রেই ভাগবতী শক্তি সর্ব্বদা অন্তরালে কাজ করে চলেছে—একদিন, যখন হয়ত আদৌ আশা করা যায় নাই, বাধাটি ভেঙ্গে পড়ে, মেঘ উড়ে যায়, আলো

ও রৌদ্র আবার ফিরে আসে। এ রকম সব অবস্থায়, সব চেয়ে সুবুদ্ধির কাজ হল, যদি অবশ্য তা পারা যায়, উদ্‌ব্যস্ত না হওয়া, নিরাশ না হওয়া, শান্তভাবে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকা, নিজেকে আলোর দিকে উন্মীলিত প্রসারিত করা, শ্রদ্ধা নিয়ে তার আগমনের প্রতীক্ষায় থাকা—এ রকমে আমি দেখেছি দুর্ভোগের কাল কমে আসে। পরে, যখন বাধা দূর হয়ে যায়, তখন দেখা যায় উন্নতি অনেকখানি হয়েছে, চেতনারও গ্রহণ ও ধারণ সামর্থ্য পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বেশি হয়েছে। অধ্যাত্ম-জীবনে যত পরীক্ষা ও আপদ্‌ভোগ তাদের প্রতিদানে লাভের হিসাবও আবার আছে।

*
* *

এ কথা ঠিক, নিজের প্রকৃতিগত ত্রুটির সাথে পরিচিত না হলে ভাগবত শক্তির সাথে পরিচয় হয় না, সে প্রকৃতিকে ভাগবত শক্তির সাথে সমস্থরে বাঁধা যায় না। কিন্তু তাই বলে ও-সব ত্রুটির উপর বা যত বাধা তারা সৃষ্টি করে তাদের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া, অথবা বাধা ভোগ করতে হয় বলে ভাগবতী শক্তির কার্য্যে আস্থা হারান, অথবা জিনিষের খারাপ দিকটিকেই নিরন্তর অতিমাত্র লক্ষ্যের বিষয় করে তোলাও চেতনার ভুল গতি। এ রকম করলে বাধা-বিঘ্নের জোর বেড়েই যায়, দোষ ত্রুটি সকলের বর্ত্তে থাকবারই অধিকতর অধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য আমি বলি না 'কুয়ে'র মত ভরসাপন্থী না হলে চলবে না—যদিও অত্যধিক নির্ভরসা হওয়া অপেক্ষা অত্যধিক ভরসা-পরায়ণ হলেই বেশি ফল পাওয়া যায়। 'কুয়ে'-পন্থা বাধা-বিঘ্নকে চাপা দিয়ে রাখতে চায়, তা ছাড়া, সব জিনিষেরই একটা মাত্রা আছে এবং সে মাত্রাকে সর্ব্বদাই মেনে চলা ভাল। কিন্তু তুমি যে বাধা-বিঘ্ন সব চাপা দিয়ে রাখবে, বা অতিরিক্ত উজ্জল একটা পরিকল্পনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখবে—তোমার পক্ষে সে আশঙ্কা নাই; বরং তার বিপরীত, তুমি সদা-সর্ব্বদা ছায়ার উপর অতিমাত্রায় জোর দাও, এ রকমে তাকে

কেবল গাঢ়তর করে তোল আর জ্যোতির মধ্যে উত্তরণের পথ-বাটগুলি বন্ধ করে দাও। চাই বিশ্বাস, আরো বিশ্বাস! তোমার নিজের ভাবী সব সম্ভাবনায় বিশ্বাস, আবরণের অন্তরালে কর্ম্মনিরত ভাগবতী শক্তিতে বিশ্বাস, করণীয় কর্ম্মে বিশ্বাস, আর যে দিব্য সহায় তোমাকে পথ দেখিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত তার উপর বিশ্বাস।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের তো কথাই নাই, কোন প্রকার মহৎ প্রয়াসই থাকতে পারে না যেখানে অত্যন্ত দৃঢ় ধরণের দুরপনেয় বাধা-বিঘ্ন সব উত্থিত বা উপস্থাপিত হয় না। বাধা-বিঘ্ন বাহিরের ও ভিতরের দুই রকমই আছে। মোটের উপর মূলতঃ সেগুলি সকল সাধকের পক্ষে এক হলেও, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে অনুপাত, যে বাহ্যরূপ তারা গ্রহণ করে সে সকলের মধ্যে অনেক পার্থক্য আসতে পারে। কিন্তু সত্যসত্যই যে একটিমাত্র জিনিষ দুরূহ তা হল ভাগবত জ্যোতি ও শক্তির কর্ম্মধারায় নিজের প্রকৃতিকে মিলিয়ে ধরা। এ সমস্যাটির মীমাংসা কর, তা হলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না বা শুধু একটা গৌণ স্থান গ্রহণ করবে। এমন কি যে সব বাধা-বিঘ্ন আরও সাধারণ ধরণের, বেশি স্থায়ী, কারণ তারা রূপান্তর কাজটির অন্তর্নিহিত, তাদেরও ভার আর দুর্ব্বহ বোধ হবে না, কারণ সাথে সাথে তোমার এ অনুভব থাকবে যে ভাগবতী শক্তি তোমাকে ধারণ করে রয়েছেন, তাঁর গতি অনুসরণ করে চলবার সামর্থ্যও তোমার বর্দ্ধিত হয়েছে।

*
* *

অনুভূতিটির সম্পূর্ণ বিস্মৃতি অর্থ, ভিতরের যে চেতনা একরকম সমাধির মধ্যে অনুভূতিটি পায় আর বাহিরের জাগ্রত চেতনা, এই দুয়ের যোগসূত্র যথেষ্ট নাই। উর্দ্ধতর চেতনা যখন এই দুয়ের মধ্যে যোগসূত্রটি স্থাপন করে দেয়, তখন বাহ্য চেতনাও স্মরণে রাখতে সুরু করে।

*
* *

রূপান্তরের জন্য সমগ্র সত্তাটি যতদিন প্রস্তুত না হয়ে ওঠে ততদিন আস্পৃহার বল ও সাধনার সামর্থ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অপরিহার্য্য, সকল সাধকের পক্ষেই তা ঘটে। অন্তঃপুরুষ যখন সম্মুখে বা সক্রিয়, এবং মন ও প্রাণের তাতে সম্মতি আছে, তখন দেখা দেয় সাধনার তীব্রতা। আর অন্তঃপুরুষ যখন তত পুরোভাগে নয়, নিম্নতন প্রাণ তার সাধারণ গতিবিধি নিয়ে আছে কিম্বা মন আছে তার অজ্ঞ ক্রিয়া নিয়ে তখন সাধক যদি বিশেষভাবে সজাগ না থাকে তা হলে বিরোধী শক্তিরা এসে উপস্থিত হতে পারে। সাধারণ শারীর চেতনা হতেই সচরাচর জড়তা এসে থাকে, বিশেষতঃ প্রাণশক্তির জোর যখন সাধনাকে সতেজ করে রাখে না। এ সকল জিনিষের কেবল প্রতীকার হতে পারে সত্তার সকল অংশের মধ্যে উর্দ্ধতর অধ্যাত্ম চেতনাকে ক্রমাগত নামিয়ে আনতে পারলে।

*
* *

চেতনার মাঝে মাঝে অধোগতি সকলেরই হয়। তার কারণ বহুবিধ —বাহির হতে কোন স্পর্শ, প্রাণে বিশেষতঃ নিম্নতর প্রাণে এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই বা যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয় নাই এমন কিছু, প্রকৃতির শারীর স্তর হতে উত্থিত কোন জড়তা বা মালিন্য। এ রকম যখন ঘটে তখন শান্ত থাকবে, মায়ের কাছে নিজেকে খুলে ধরবে, খাঁটি অবস্থাটি আবার ফিরিয়ে আনবে আর যে-জিনিষকে সংশোধন করে ধরতে হবে, তার কারণটি তোমার ভিতর থেকেই দেখিয়ে দিতে পারে এমন এক নির্ম্মল ও অচঞ্চল বিচক্ষণতার জন্য আস্পৃহা রাখবে।

*
* *

দুটি গতিতরঙ্গের মাঝখানে সর্ব্বদাই থাকে আয়োজনের ও পরিপাকের জন্য যতি। সাধনার মধ্যে একটা বেসুর ফাঁক বলে একে তুমি বিরক্তি বা অধৈর্য্যের চোখে দেখবে না। তা ছাড়া শক্তি উপরের দিকে চলে, প্রকৃতির একটি অংশকে উর্দ্ধতর একটা ভূমিতে

তুলে ধরে, আবার নেমে আসে নিম্নতর একটা স্তরকে তুলে ধরবার জন্য। এই উত্তরণ-অবতরণের পারম্পর্য্য অনেক সময়ে অত্যন্ত পীড়াদায়ক—কারণ মন পছন্দ করে একটানা ঋজু ঊর্দ্ধগতি, আর প্রাণও আশু ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব বলে ও-রকম জটিল গতিধারাটি বুঝে উঠতে বা অনুসরণ করতে পারে না, তাই স্বভাবতঃ হয় তাতে ক্লেশ পায়, নয় তাকে আমল দিতে চায় না। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতির রূপান্তর সহজসাধ্য বস্তু নয়—যে মহাশক্তি সে-কাজ করছে তার জ্ঞান আমাদের মানস অজ্ঞতা বা প্রাণজ অধৈর্য্য যা জানে তার অপেক্ষা অনেক বেশি।

*
* *

এমন একটি মূল সঙ্কল্পশক্তি যদি না থাকে যা প্রকৃতির যাবতীয় শক্তিতরঙ্গের ঊর্দ্ধে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বদাই মায়ের সাথে যার সংযোগ রয়েছে, যা নিজের মূল লক্ষ্য ও আস্পৃহা অনুসারে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবে যোগসাধনায় গুরুতর বাধা রয়েছে বলতে হবে। এরকম হওয়ার অর্থ তোমার মূল সত্তায় বাস করতে তুমি এখনও অভ্যস্ত হও নাই; তোমার অভ্যাস হল, যখন যে কোন রকমের শক্তিতরঙ্গ তোমার উপর ছুটে আসে তারই সাথে ভেসে যাওয়া, সে সময়ের জন্য তার সাথে নিজেকে একাত্ম করে ফেলা। যে-সব জিনিষ তুমি শিখেছ কিন্তু যাদের ভুলতে হবে তাদের মধ্যে এই হল একটি। তোমার যে মূল সত্তা, যার প্রতিষ্ঠা হল অন্তঃপুরুষ, তাকে আবিষ্কার করতে হবে, তার মধ্যে বাস করতে হবে।

*
* *

যুদ্ধ যতই কঠোর হোক, একমাত্র উপায় এখনই ও এইখানেই শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধ সাঙ্গ করা।

মুস্কিল এই যে তোমার যথার্থ বাধাটির সম্পূর্ণ সম্মুখীন তুমি

কখনও হও নাই, তাকে জয় কর নাই। তোমার প্রকৃতির একেবারে মূলেই একটি স্থানে একটা দৃঢ় অহমাত্মক ব্যক্তিত্বের বিগ্রহ গড়ে উঠেছে, ঐ জিনিষটি তোমার আধ্যাত্মিক আস্পৃহার মধ্যে দুরপনেয় আত্মশ্লাঘা ও আধ্যাত্মিক পদাকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত করে দিয়েছে। এই বিগ্রহ কখনও নিজের ধ্বংস-সাধনে সম্মতি দেয় নাই, যাতে তার পরিবর্ত্তে সত্যতর ও ভাগবত কোন বস্তুর স্থান হতে পারে। ফলে মা যখনই তাঁর শক্তি তোমার উপরে প্রয়োগ করেছেন, অথবা তুমি নিজে যখন তাকে নিজের উপর আকর্ষণ করেছ, তখনই তোমার অহমিকা মায়ের শক্তিকে তার আপন পথে কাজ করতে দেয় নাই। মনের ধারণা অনুসারে কি প্রাণের কোন দাবি অনুসারে সে নিজেই গড়ে তুলতে সুরু করেছে, তার চেষ্টা নিজের শক্তিতে, নিজের সাধনায়, নিজের তপস্যা দিয়ে "নিজের পথে" সে নিজের সৃষ্টি একটা করবে। এরমধ্যে কোন বাস্তবিক সমর্পণ ছিল না, ভগবতী জননীর হাতে অকুণ্ঠভাবে সহজভাবে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া ছিল না। অথচ অতিমানস যোগে সাফল্য ঠিক ঐ একমাত্র উপায়ে হতে পারে। যোগী হওয়া, সন্ন্যাসী হওয়া, তপস্বী হওয়া এখানকার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য রূপান্তর আর সে রূপান্তর কেবল হতে পারে তোমার নিজের অপেক্ষা অনন্তগুণে বৃহত্তর এক শক্তির দ্বারা—তা শুধু হতে পারে মায়ের হাতে সত্যসত্যই শিশুটির মত হয়ে উঠলে।

*
* *

যোগ-সাধনায় সাফল্যের আশা যে তোমার পরিত্যাগ করতে হবে তার কোন কারণই নাই। যে অবসাদের অবস্থা তুমি বর্ত্তমানে অনুভব কর, তা সাময়িক, অতিশক্তিমান সাধকেরও কোন না কোন সময়ে তা আসে, এমন কি প্রায়ই বার বার আসে। ফলতঃ এই অবসাদ হল একটা অবস্থান্তরের বা পরিবর্ত্তনের অঙ্গ এবং যে পর্য্যন্ত

সে অবস্থান্তর বা পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ সজ্ঘটিত না হয়েছে সে পর্য্যন্ত একমাত্র প্রয়োজন সত্তার জাগ্রত অংশটি ধরে দৃঢ় থাকা, সকল বিপরীত প্রণোদনা প্রত্যাখ্যান করা, যতখানি তোমার সাধ্য সত্য-শক্তিটির দিকে নিজেকে উন্মীলন ক'রে অপেক্ষা করা। তোমার মনে যে-সব প্রণোদনা এসে তোমাকে বলে তুমি যোগ্য নও, সাধারণ জীবন-ধারায় তোমাকে ফিরে যেতেই হবে, সে সব হল অদিব্য শক্তির মন্ত্রণা। এরকম ধারণা সব নিম্ন প্রকৃতির কল্পনা বলে সর্ব্বদা প্রত্যাখ্যান করবে। অজ্ঞ মনের কাছে দৃশ্যতঃ সত্যপ্রতিষ্ঠ বলে বোধ হলেও, তারা মিথ্যা—কারণ, একটা অস্থায়ী গতিধারাকে তারা অতিকায় করে ধরে, তাকেই চরম ও পরম সত্য বলে দেখায়। তোমার মধ্যে একটি মাত্র সত্য আছে যাকে সদা-সর্ব্বদা তোমাকে ধরে থাকতে হবে, তা হল তোমার দিব্য-সম্ভাবনারাজির সত্য আর উর্দ্ধতর জ্যোতির দিকে তোমার প্রকৃতির আকূতি। সদাসর্ব্বদা যদি তুমি ঐ জিনিষটিকে ধরে থাক কিম্বা মাঝে মাঝে শিথিলমুষ্টি হলেও, ফিরে আবার শক্ত করে ধর, তা হলে সকল বাধা-বিঘ্ন বিচ্যুতি সত্ত্বেও পরিণামে সাফল্য সে নিয়ে আসবেই। তোমার অধ্যাত্ম-প্রকৃতির ক্রমবিকাশের সাথে যথা সময়ে সব অন্তরায় দূরীভূত হয়ে যাবে।

প্রয়োজন হল প্রাণস্তরের ধর্ম্মান্তর ও আত্মসমর্পণ। কেবল উর্দ্ধতম সত্যকেই আকাঙ্ক্ষা করা, আপন নিম্নতর প্রেরণা ও বাসনা চরিতার্থতার উপর আগ্রহ পরিহার করা প্রাণকে শিক্ষা করতে হবে। প্রাণময় পুরুষের এই সহযোগের ফলে অধ্যাত্ম-জীবনেরই মধ্যে সমগ্র প্রকৃতি পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। এ যখন হবে তখন সাধারণ জীবন-যাত্রায় ফিরে যাবার চিন্তা পর্য্যন্ত আসতে পারে না। ইতিমধ্যে মানস সঙ্কল্প আর অন্তঃপুরুষের আস্পৃহাকে ধরে থাকতে হবে—তুমি যদি ক্রমাগত জোর দিতে থাক তবে শেষে প্রাণসত্তা বশে আসবে, ধর্ম্মান্তরিত হবে, আত্মসমর্পণ করবে।

মনের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে এই দৃঢ় সঙ্কল্প গেঁথে রাখ যে ভাগবত সত্যের জন্য—কেবল ভাগবত সত্যেরই জন্য তোমার জীবন ধারণ। এর বিপরীত বা বিসদৃশ যা কিছু সব পরিহার কর, নিম্নতন বাসনা-রাজি ছেড়ে ফিরে দাঁড়াও। এই আস্পৃহা রাখ যাতে আর কোন শক্তি নয়, কেবল মাত্র ভাগবতী শক্তিরই কাছে আপনাকে উন্মীলিত করতে পার। অখণ্ড ঐকান্তিকতা দিয়ে কাজটি কর—তা হলে যে সাক্ষাৎ জাগ্রত সাহায্য তোমার প্রয়োজন তা হতে তুমি কখন বঞ্চিত হবে না।

*
* *

তুমি যথাযথ মূলভাবটিই গ্রহণ করেছ। তোমার উপর যে-সব আক্রমণ সময়ে সময়ে আসে ও তোমাকে যথার্থ চেতনাটি হতে বিচ্যুত করে তাদের তুমি এত সত্বর জয় করতে পার ঐ অনুভব ও মূলভাবের সহায়ে। তুমি ঠিকই বলেছ—বাধা এইভাবে গ্রহণ করলে সুযোগে পরিণত হয়। ঠিক মনোভাব নিয়ে যদি বাধার সম্মুখীন হওয়া যায় ও জয়ী হওয়া যায়, তা হলে দেখা যায় একটা রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, একধাপ অগ্রসর হওয়া গিয়েছে। যদি প্রশ্ন তোল, সত্তার কোন অংশ যদি বিরুদ্ধাচরণই করে, তবে তাতে বাধা ও বিপত্তি বেড়েই যায়। সেই জন্যই প্রাচীন ভারতীয় সব যোগপন্থায় গুরুর নির্দ্দেশ অসংশয়ে গ্রহণ ও একনিষ্ঠভাবে পালন অপরিহার্য্য বিধি ছিল—আর সে বিধি গুরুর নয় শিষ্যেরই প্রয়োজনের জন্য।

*
* *

জিনিষ দেখা এক আর সে সবকে তোমার ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য। অনেক জিনিষের পরিচয় গ্রহণ করা দরকার; সে সব দেখা, পর্য্যবেক্ষণ করা, চেতনার ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের নিয়ে আসা, তারা কি বস্তু জানা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু সে জন্য তাদের যে

তোমার ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে বা তোমাকে অধিকার করতে দেবে এমন কারণ নাই। ভগবানকে অথবা ভগবানের কাছ থেকে যা আসে তাকেই তোমার ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া চলতে পারে।

সব আলোই ভাল একথাটি বলা হল সব জলই ভাল, এমন কি সব পরিষ্কার বা স্বচ্ছ জলই ভাল এ কথাটি বলার মত—অর্থাৎ কথাটি সত্য হবে না। দেখতে হবে আলোটির প্রকৃতি কি অথবা কোথা হতে আসছে বা কি আছে তার মধ্যে, তার আগে বলা চলে না এটি খাঁটি আলো। মিথ্যা আলোও আছে, ভুল পথে নিয়ে যায় যে ঔজ্জ্বল্য, সত্তার অধস্তন সব স্তরে নিম্নতর যে আলো তারাও আছে। সুতরাং সাবধান হতে হবে, পার্থক্য দেখতে হবে। সত্যকার বিচারশক্তি দেখা দেয় তখন যখন অন্তঃপুরুষগত অনুভব আর সম্যক্ শুদ্ধ মন ও অভিজ্ঞতা বিকশিত হতে থাকে।

*
* *

যে চীৎকার তুমি শুনেছ তা তোমার স্থূল হৃদ্‌পিণ্ডে নয়, তা হল হৃদয়াবেগের কেন্দ্রে। দেয়াল ভেঙ্গে পড়া অর্থ তোমার ভিতরের ও বাহিরের সত্তার মাঝখানে যে বাধাটি রয়েছে তা ভেঙ্গে পড়া, অন্ততঃ সেখানে কিছু একটা বাধা ভেঙ্গে পড়া। অধিকাংশ লোক তাদের সাধারণ বাহ্য অজ্ঞ সত্তাটি ধরে জীবন যাপন করে, আর তা সহজে ভগবানের দিকে নিজেকে খুলে ধরে না; কিন্তু তাদের ভিতরে একটা অন্তঃস্থ সত্তা আছে, যার সম্বন্ধে তারা অচেতন, কিন্তু সত্যের দিকে আলোর দিকে যা সহজেই আপনাকে খুলে ধরে। কিন্তু এ বস্তু থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে একটা দেয়াল, নিরালোকের অচেতনার এক দেয়াল। দেয়াল যখন ভেঙ্গে পড়ে, তখন আসে একটা মুক্তি। তুমি যে প্রশান্তি ও আনন্দের অনুভব অনতিপরেই পেয়েছিলে তার হেতু ঐ মুক্তি। তুমি যে চীৎকার শুনেছিলে তা

তোমার প্রাণস্তরের চীৎকার—দেয়ালটি আচম্বিতে ভেঙ্গে পড়ায় ও আচম্বিতে উন্মুক্তি ঘটায় সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

*
* *

সাধারণতঃ চেতনা শরীরের মধ্যে বন্দী থাকে, আর তা কেন্দ্রীভূত হয় মস্তকে, হৃদয়ে ও নাভিস্থলে অর্থাৎ যথাক্রমে মনোময়, আবেগময় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিময় কেন্দ্রে। যখন তুমি অনুভব কর যে চেতনা বা তার কোন অংশ ঊর্দ্ধে উঠে গিয়ে মাথার উপরে স্থান গ্রহণ করেছে, তখন সেটি হল বন্দী চেতনার শারীর আয়তন হতে মুক্তি। এখানে তোমার মানস সত্তাটিই উপরে উঠে যায়, সাধারণ মনের অপেক্ষা উচ্চতর একটা কিছুর সংস্পর্শে আসে আর সেখান হতে উচ্চতর মানস-সঙ্কল্পকে রূপান্তর সাধনের জন্য আধারের অবশিষ্ট অংশের উপর প্রয়োগ করে। শরীর ও প্রাণের কাছে এই যে দাবি করা হয় আর তাদের এই যে মুক্তি-লাভ এতে তারা অভ্যস্ত নয় বলে, একটা বাধা আছে বলেই কম্পন ও উত্তাপ দেখা দেয়। মানসচেতনা যখন স্থায়িভাবে বা ইচ্ছামত এই রকম ঊর্দ্ধস্থ থাকে, তখনই মুক্তির প্রথম পাদ সিদ্ধ। সেখানে থেকে মনোময় পুরুষ আরও ঊর্দ্ধতর স্তরসমূহে কিম্বা বিশ্বসত্তায় এবং বিশ্বসত্তার শক্তি-রাজির দিকে আপনাকে স্বচ্ছন্দে খুলে ধরতে পারে আর নিম্নতন প্রকৃতির উপরও অধিকতর স্বাধীনতা ও শক্তি নিয়ে কাজ করতে পারে।

*
* *

ভাগবত প্রকাশ চলে প্রশান্তি ও সামঞ্জস্যকে আশ্রয় করে, একটা প্রলয়ঙ্কর বিপর্য্যয়কে আশ্রয় করে নয়। শেষোক্ত জিনিষটি সংঘর্ষের লক্ষণ —সাধারণতঃ সে সংঘর্ষ বিরোধী প্রাণশক্তিদের মধ্যে, অন্ততপক্ষে তা ঘটে একটা নিম্নতর স্তরে।

প্রতিকূল শক্তিদের কথা তুমি বড় বেশি চিন্তা কর। এ রকম দুশ্চিন্তাপরায়ণতা অনেক অনাবশ্যক দ্বন্দ্বের কারণ। অভাবের নয়, বরং ভাবের দিকটির উপর মনঃসংযোগ কর। মায়ের শক্তির দিকে নিজেকে খুলে ধর, তাঁর অভয়ের ধ্যান কর আর জ্যোতি, স্থিরতা, শান্তি ও শুচিতার জন্য এবং ভাগবত চেতনায় ও জ্ঞানে সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা কর।

পরীক্ষার ধারণাটিও স্বাস্থ্যকর নয়—দেখতে হবে তা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। ভগবান্ পরীক্ষা নিয়ে আসেন না, পরীক্ষা নিয়ে আসে নিম্নতন স্তরের—মনের, প্রাণের, জড়ের—শক্তিসমূহ। ভগবান্ শুধু তাতে বাধা দেন নাই, এই জন্য যে ও-জিনিষটি অন্তরাত্মার শিক্ষার অঙ্গ, অন্তরাত্মাকে সাহায্য করে যাতে সে নিজেকে নিজে জানতে পারে, নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে আর যেসব গণ্ডী পার হয়ে যেতে হবে তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান তার হয়। মা তোমাকে প্রতিপদে যে পরীক্ষা করছেন তা নয় বরং প্রতিপদে তোমাকে সাহায্য করছেন যাতে তুমি নীচের চেতনারই জিনিষ এই যে সব পরীক্ষা, বাধা-বিঘ্ন তাদের দায় ছাড়িয়ে উপরে উঠে যেতে পার। এই সাহায্যের চেতনা তুমি যদি সর্ব্বদা জাগ্রত রাখতে পার, তবে তাই হল শত্রুশক্তির হোক আর তোমার নিজের নিম্ন প্রকৃতির হোক সকল রকম আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

*
* *

অশুভ শক্তিরা নিজেদের একটা কর্ত্তব্য নিজেরা ঠিক করে নিয়েছে—তা হল সাধকের কর্ম্মধারার, আর পৃথিবীরও অবস্থা পরীক্ষা করা, এরা অধ্যাত্ম-অবতরণের ও সিদ্ধির জন্য কতখানি প্রস্তুত তা যাচাই করা, কষে দেখা। পথের প্রতিপদে তারা রয়েছে, ক্রোধান্ধ হয়ে আক্রমণ করে, দোষত্রুটি দেখায়, কুমন্ত্রণা দেয়, হতাশা ডেকে আনে, বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করে, অবিশ্বাস জাগায়, বাধা-বিঘ্ন স্তূপীকৃত ক'রে ধরে। অবশ্য কোন সন্দেহ নাই এই কর্ম্ম থেকে তাদের যে অধিকার জন্মেছে তাকে

তারা অতিরঞ্জিত ক'রে দেখে, আমাদের চোখে যা বল্মীকস্তূপ তাদের চোখে তাই হয় পর্ব্বতমালা। সামান্য একটুখানি বিপথে পা পড়েছে কি ভুল হয়েছে অমনি তারা এসে উপস্থিত, রাস্তাটি বন্ধ ক'রে সমগ্র হিমালয় যেন এনে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রতিকূলতা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই যে ঘটতে দেওয়া হয়েছে তা কেবল পরীক্ষা হিসাবে নয় কিন্তু এই জন্য যে এতে জোর ক'রে আমাদের বাধ্য করে যাতে একটা মহত্তর শক্তি, পূর্ণতর আত্মজ্ঞান, আস্পৃহার তীব্রতর শুচিতা ও বল, এমন বিশ্বাস কোন কিছুই যাকে বিনষ্ট করতে পারে না, ভাগবত প্রসাদের একটা অধিকতর শক্তিময় অবতরণ আমরা লাভ করতে পারি।

*
* *

উপরের শক্তির অবতরণ হয় যে নিম্নতন শক্তি সব জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তা নয়—তবে বর্ত্তমানে তাকে যে ভাবে কাজ করতে হয়, সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলে এই উৎক্ষেপ ঘটে। প্রয়োজন হল সমগ্র প্রকৃতির মূলে স্থির ও উদার চেতনার প্রতিষ্ঠা—তার ফল হবে এই, নিম্নতন প্রকৃতি উঠে দেখা দিলেও তা একটা আক্রমণ বা দ্বন্দ্বের রূপ নিয়ে আসবে না, বোধ হবে যিনি সকল শক্তির অধিপতি তিনি সেখানেও রয়েছেন, তিনিই বর্ত্তমান যন্ত্রটির দোষত্রুটি দেখছেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে তাকে সংশোধনের জন্য, তার পরিবর্ত্তনের জন্য যা প্রয়োজন তাই ক'রে চলেছেন।

*
* *

এ সব হল অজ্ঞানের শক্তি—তারা প্রথমে বাহির হতে অবরোধ ক'রে ধরে, তারপর সদলে একযোগে আক্রমণ করে, অভিভূত ক'রে ফেলবার জন্য, দখল ক'রে বসবার জন্য। এ রকম আক্রমণ যতবার ব্যর্থ করা যায়, দূরে হটিয়ে দেওয়া যায়, ততবার সত্তার মধ্যে একটা শুদ্ধি ঘটে, মনে বা প্রাণে বা দেহে বা প্রকৃতির আর কোন সন্নিহিত অংশে একটা নূতন ক্ষেত্র মায়ের জন্য অধিকার করা হয়। তোমার

প্রাণস্তরে মায়ের স্থান বিস্তৃত হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ এই, পূর্ব্বে যে সব অবরোধ তোমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলত এখন তাদের বিরুদ্ধে তোমার বাধা দেবার শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সব সময়ে মায়ের অধিষ্ঠানকে, শক্তিকে আহ্বান করতে পারাই হল সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু উপায়।

মা সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে, তোমার মধ্যে, তাঁরই সাথে তোমার কথাবার্ত্তা হয়—তবে প্রয়োজন ঠিকমত শোনা, যেন আর কোন কণ্ঠ মায়ের বলে ভুল না হয়, তোমার ও তার মধ্যে এসে না দাঁড়ায়।

*
* *

তোমার মন-আর অন্তঃপুরুষ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ, একাগ্র ও ভগবানের দিকে উন্মুক্ত—তাই ভাগবত প্রভাব কেবল মস্তিষ্ক ও হৃদয় অবধি অবতরণ করে। কিন্তু প্রাণময় সত্তা ও প্রকৃতি আর শারীর চেতনা নিম্নতন প্রকৃতির প্রভাবে রয়েছে। যতদিন প্রাণসত্তা ও শারীর সত্তা সমর্পিত না হয় কিম্বা নিজেরাই আপনা হতে ঊর্দ্ধতর জীবন কামনা না করে, ততদিন দ্বন্দ্ব চলবারই কথা।

সব সমর্পণ কর, আর সকল বাসনা ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও, ভাগবত শক্তিকে আহ্বান কর যাতে প্রাণময় প্রকৃতিকে তিনি উন্মুক্ত করেন, যাবতীয় কেন্দ্রে স্থিরতা শান্তি জ্যোতি আনন্দ নামিয়ে আনেন।

অস্পৃহাপরায়ণ হও, বিশ্বাস রেখে ধৈর্য্য ধরে—ফলের অপেক্ষা কর। সব নির্ভর করে অখণ্ড আন্তরিকতা আর সর্ব্বাঙ্গীণ উৎসর্গ ও অস্পৃহার উপর।

জগৎ ততদিন তোমাকে উদ্বিগ্ন করবে, যতদিন তোমার কোন একটি অঙ্গ জগতের অধিকারে থাকবে। তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হয়ে যেতে পার, তখনই কেবল তোমার মুক্তি সম্ভব।

*
* *

ধৈর্য্যের সাথে দৃঢ়তার সাথে জীবন ও জীবনের বাধাবিঘ্নসকল সাক্ষাৎ করবার সাহস যার নাই, সে কখন সাধনায় আরও কঠিনতর আন্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যেতে পারবে না। এ যোগের একেবারে প্রথম শিক্ষাই হল প্রশান্ত মন, দৃঢ় সাহস, ভাগবত শক্তির উপর অখণ্ড নির্ভর নিয়ে জীবন ও জীবনের পরীক্ষা সকলের সম্মুখীন হতে হবে।

*
* *

আত্মহত্যা হল অর্থহীন মীমাংসা—এতে যে সে শান্তি পাবে এ ধারণা তার সম্পূর্ণ ভুল। তার বাধাবিপত্তি সব সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুর পরে সে অধিকতর দুর্গতির মধ্যে গিয়ে পড়বে, আবার পৃথিবীতে আর এক জন্মে সে-সমস্তই ফিরে নিয়ে আসবে। একমাত্র প্রতিকার হল এ সকল দুঃস্থ ধারণা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া, জীবনের লক্ষ্য-স্বরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য একটা পরিষ্কার সঙ্কল্প ধরে, ধীর ও তৎপর সাহসের সাথে জীবনের সম্মুখীন হওয়া।

*
* *

সাধনা এই শরীর নিয়েই করতে হবে, শরীর ছেড়ে শুধু আত্মাকে দিয়ে সাধনা হয় না। শরীরটি যখন খসে পড়ে, আত্মা তখন অন্যান্য লোকে বিচরণ করে—শেষে আর এক জন্ম, আর এক শরীর গ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্মের যে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের সে সমাধান করে নাই, তারা এই নূতন জন্মে তাকে আবার ঘিরে ধরে। সুতরাং শরীর ত্যাগ ক'রে লাভ কি ?

তা ছাড়া, জোর করে শরীর নষ্ট করলে মৃত্যুর পরে অন্যান্য লোকে অনেক কষ্ট পেতে হয়, তারপর নূতন জন্ম গ্রহণ করলে তখন ভাল নয় আরও খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়।

একমাত্র সুবুদ্ধির কাজ হল এই জীবনে, এই দেহে বাধাবিঘ্নসকলের সম্মুখীন হওয়া, তাদের জয় করা।

*
* *

সব যোগেই লক্ষ্যস্থানে পৌছান দুষ্কর, এ যোগে তা আবার অন্য সব যোগের অপেক্ষা আরো দুষ্কর। যারা অন্তরে সাড়া পেয়েছে, যাদের সামর্থ্য আছে, যারা সব কিছুর, সকল আপদের, এমন কি ব্যর্থতারও সম্মুখীন হতে প্রস্তুত, একটা পরিপূর্ণ নিরহঙ্কারতার, নিষ্কামতার, সমর্পণের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য যাদের রয়েছে দৃঢ় সঙ্কল্প কেবল তাদেবই জন্য এই যোগ।

*
* *

কোন জিনিষ বা কোন মানুষ যেন তোমার ও মাতৃশক্তির মাঝখানে এসে না দাঁড়ায়। সফলতা নির্ভর করবে সেই শক্তিকে গ্রহণ ও ধারণ করার উপর, সত্য অনুপ্রেরণায় সাড়া দেওয়ার উপর, মানসরচিত কোন ধারণার উপর নয়। এমন কি যে সব ধারণা পরিকল্পনা অন্য হিসাবে হয়ত কাজে লাগতে পারে, তারাও ব্যর্থ হবে যদি তাদের পিছনে সত্য প্রণোদনা, সত্য শক্তি ও প্রভাব না থাকে।

*
* *

বাধাটি নিশ্চয়ই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার ফলে এসেছে। কারণ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা মিথ্যাচারেরই মত—তারা নিজেরাও মিথ্যাময়, তাদের প্রতিষ্ঠা হল মিথ্যা ধারণা ও প্রেরণা—তারা মহাশক্তির কাজে বিঘ্ন ঘটায়, এর অনুভূতি হতে দেয় না, একে পূর্ণভাবে কর্ম্ম করতে দেয় না, এর রক্ষণসামর্থ্য হ্রাস করে।

কেবল তোমার অন্তর্মুখী ধ্যানে নয়, তোমাকে বাহিরের

কার্য্যকলাপেও মূল-ভাবটি ঠিক রাখতে হবে। তা যদি করতে পার, মাতৃশক্তিকেই যদি সব-কিছু পরিচালনা করতে দাও, তা হলে দেখবে বাধা-বিঘ্ন কমে আসছে, অন্তত তাদের অতিক্রম করা সহজ হয়েছে, পথ ক্রমেই সুগম হয়ে চলেছে।

ধ্যানমুখী সাধনায় যা কর, কাজেকর্ম্মেও ঠিক তাই করবে। মায়ের কাছে নিজেকে খুলে ধর; কাজকর্ম্ম সব তাঁকেই পরিচালনা করতে ছেড়ে দাও; শান্তিকে, আশ্রয়-শক্তিকে, মায়ের অভয়কে ডেকে নিয়ে এস; আর এসকল যাতে অবাধে তাদের কাজ করতে পারে সেই জন্য যত ভ্রান্ত প্রভাবকে প্রত্যাখ্যান করবে—কারণ এরা ভ্রান্ত অনবধান অচেতন ক্রিয়া সব সৃষ্টি ক'রে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে পারে।

এই নীতিটি অনুসরণ করে চল, তা হলে তোমার সমগ্র সত্তা শান্তির মধ্যে, শরণাস্পদ শক্তি ও জ্যোতির মধ্যে, এক ও অখণ্ড শাসনে এক ও অখণ্ড হয়ে উঠবে।

*
* *

আমি যখন অন্তরাত্মার জ্যোতি ও ভাগবত আহ্বানের কাছে একনিষ্ঠ হয়ে থাকার কথা বলেছিলাম, তখন অতীতের কোন ঘটনা অথবা তোমার ব্যক্তিগত কোন ত্রুটি আমার লক্ষ্যের বিষয় ছিল না। সকল সঙ্কটে ও শত্রুর আক্রমণে বিশেষ প্রয়োজন যে জিনিষ আমি কেবল তারই নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম—কোন কুমন্ত্রণা, দুষ্ট প্রেরণা বা প্রলোভনের বাণী কানেও তুলবে না, তাদের সকলের বিরুদ্ধে স্থাপন করবে সত্যের আহ্বান, জ্যোতির অলঙ্ঘ্য ইসারা। সকল সংশয় ও অবসাদে বলবে "আমি ভগবানের, আমার বিফলতা নাই"। অশুচিতা ও অযোগ্যতার ইঙ্গিতমাত্রে উত্তর দেবে "আমি অমৃতের সন্তান, ভগবান আমাকে বরণ করেছেন; আমাকে কেবল আমার নিজের উপর আর ভগবানের উপর সত্যসন্ধ হতে হবে—তা হলে জয় নিশ্চিত। আমি

যদি পড়েও যাই আবার উঠে দাঁড়াব"। ফিরে চলে যাওয়ার, ক্ষুদ্রতম আদর্শ অনুসরণ করবার প্রেরণাকে উত্তরে বলবে "এই ত শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, কেবল এই সত্যই ত আমার অন্তরস্থ আত্মার তৃপ্তি সাধন করতে পারবে; সকল পরীক্ষা ও দুর্গতির ভিতর দিয়ে আমি এই দিব্যপথ-যাত্রার শেষ অবধি চলে যাব।" জ্যোতি ও ভাগবত আহ্বানের উপর নিষ্ঠা অর্থে আমি এই বুঝি।

বাসনা—আহার—কাম

প্রাণের সাধারণ ক্রিয়া সকলের স্থান সত্য-সত্তার ভিতরে নয়, তারা আসে বাহির হতে। তারা অন্তরাত্মার জিনিষ নয়, সেখানে তারা জন্মগ্রহণ করে না, তারা হল সাধারণ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন তরঙ্গাবলী।

বাসনা বাহির হতে আসে, অবচেতন-প্রাণস্তরে প্রবেশ করে, তারপর উপরে ভেসে ওঠে। তারা যখন উপরে ভেসে ওঠে, আর মন তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয় কেবল তখনই বাসনার জ্ঞান আমাদের আসে। বাসনা আমাদের নিজেদেরই বলে বোধ হয়, কারণ প্রাণ হতে মনের মধ্যে এই রকমে সে উঠে আসছে বলে আমরা অনুভব করি, বাহির হতে যে এসেছে তা জানতে পারি না। প্রাণের বা সত্তার যা নিজস্ব জিনিষ, যার জন্যে সে দায়ী তা স্বয়ং বাসনাটি নয় কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতি হতে প্রাণের বা সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে যে-সব প্ররোচনার প্রবাহ বা তরঙ্গ তাতে তার সাড়া দেওয়ার অভ্যাসটি।

✽

✽ ✽

বাসনা বর্জ্জন করা মূলতঃ হল বাসনার অন্তর্গত ক্ষুধাটি বর্জ্জন করা, সত্যকার আত্মার ও আন্তর সত্তার জিনিষ তা নয়, বাহিরের জিনিষ বলে তাকে চেতনার ভিতর থেকে নিষ্কাষিত করা। তবে বাসনার প্ররোচনা অনুসারে যে বাহ্য-ভোগ তাকে অস্বীকার করাও হল বাসনা-বর্জ্জনের অঙ্গ। প্ররোচিত কর্ম্ম হতে বিরত থাকা—যদি সে কর্ম্ম করণীয় কর্ম্ম না হয়—তাও যোগসাধনার অন্তর্ভুক্ত। তবে এ বিরতি যখন ভুলভাবে করা হয়, একটা মানস তপস্যার বিধি বা কঠোর একটা নৈতিক নিয়ম পালন হিসাবে, তখনই কেবল তাকে

নিগ্রহ নাম দেওয়া যায়। নিগ্রহ এবং একটা আন্তর মূল-চেতনাগত পরিহার—এই দুইয়ের পার্থক্য হল মানসিক বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও অধ্যাত্ম-শুদ্ধির মধ্যে যে পার্থক্য।

যখন যথার্থ চেতনা নিয়ে থাকা যায় তখন অনুভব হয় বাসনাগুলি রয়েছে বাহিরে, বাহির থেকে ভিতরে, নিম্নতন প্রকৃতি হতে মনে ও প্রাণময় সব অংশে প্রবেশ করেছে। সাধারণ মানুষের চেতনায় এ অনুভব হয় না—বাসনা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান হয় তখন যখন বাসনা হাজির হয়েছে, ভিতরে এসে গিয়েছে, বাসস্থান বা অভ্যস্ত আশ্রয় পেয়েছে—তাই মানুষে মনে করে বাসনা হল তার নিজের, নিজেরই একটা অংশ। সুতরাং বাসনাকে দূর করতে হলে প্রথম প্রয়োজন যথার্থ চেতনায় সচেতন হওয়া—কারণ তখনই তাকে সরিয়ে দেওয়া অনেক সহজ; নতুবা যখন তাকে আপন অঙ্গ বলে আপনার সত্তা থেকে বহিষ্কার করবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হয় তখন তা তত সহজ নয়। যাকে আমাদের আধারেরই উপাদান বলে অনুভব করি তাকে ছেঁটে ফেলতে হলে বেগ পেতে হয়, কিন্তু যা আগন্তুক পদার্থ তাকে বিদায় দেওয়া তেমন কঠিন নয়।

আর অন্তঃপুরুষ যখন সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তখনও বাসনা হতে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়। কারণ অন্তঃপুরুষের নিজের কোন বাসনা নাই, তার আছে কেবল আস্পৃহা, আছে ভগবানের জন্য আর যে-সব জিনিষ ভাগবত বস্তু বা ভগবানেরই দিকে নিয়ে চলে তাদের জন্য সন্ধিৎসা ও ভালবাসা। অন্তঃপুরুষের যদি সদা-সর্ব্বদাই প্রাধান্য থাকে তবে সত্য চেতনা আপনা হতেই ফুটে উঠতে চায়, প্রকৃতির সব গতিধারা যেন স্বতঃই সংশোধিত হয়ে যায়।

*
* *

দাবি আর বাসনা একই জিনিষের দুটি বিভিন্ন দিক মাত্র। আর বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল না হলে কোন প্রাণবৃত্তির নাম যে বাসনা হতে

পারে না এমনও নয়—বরং পক্ষান্তরে তা শান্তভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও নিত্যকার জিনিষ হয়ে থাকতে পারে, নিত্যই বার বার এসে দেখা দিতে পারে। দাবি আর বাসনা প্রাণময় বা মনোময় স্তর হতে আসে, কিন্তু অন্তঃপুরুষগত বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন হল অন্য জিনিষ। অন্তঃপুরুষের দাবিতে বাসনা নাই, তার আছে শুধু আস্পৃহা। তার আত্মসমর্পণে কোন সর্ত্ত নাই—তার আস্পৃহা যদি অবিলম্বেই পূর্ণ না হয় তবে আত্মসমর্পণ সে ফিরিয়ে নেয় না—কারণ ভগবানের ও গুরুর উপর অন্তঃপুরুষের পরিপূর্ণ আস্থা, সে ভগবৎ-কৃপার যথাযথ সময় ও মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে। হৃৎপুরুষের নিজস্ব একটা নির্ব্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাই বলে ভগবানের উপর কখন সে চাপ দেয় না, তার চাপ হল প্রকৃতির উপর, সিদ্ধির বাধা হয়ে সেখানে যত ত্রুটি রয়েছে তাদের দিকে সে নিশানা করে আলোর তর্জ্জনী, যোগানুভবের মধ্যে বা সাধনার ধারায় যা কিছু মিশ্র অজ্ঞানময় অসম্পূর্ণ তাদের বেছে ফেলে দেয়, আর যে অবধি প্রকৃতিকে সে ভগবানের কাছে পূর্ণ উন্মুক্ত করে না ধরেছে, সকল প্রকারের অহংকার হতে তাকে মুক্ত করে, সমর্পিত করে, মূলভাবটিকে ও যাবতীয় ক্রিয়াকে সরল ও সত্যময় করে না তুলেছে তদবধি নিজেকে নিয়ে বা প্রকৃতিকে নিয়ে কখন তৃপ্ত থাকতে পারে না। এই জিনিষটি প্রথমে পূর্ণরূপে মনে, প্রাণে ও শারীর চেতনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করতে হবে, তারপর সমগ্র প্রকৃতির অতিমানস রূপান্তর সম্ভব। নতুবা যা লাভ হয় তা হল মনের প্রাণের বা শারীর স্তরে ন্যূনাধিক উজ্জ্বল, অর্দ্ধস্ফুট অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন জ্যোতি ও অনুভূতি—তারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসে কোন বৃহত্তর মন বা বৃহত্তর প্রাণ হতে কিম্বা উর্দ্ধপক্ষে বুদ্ধি ও অধিমানসের অন্তর্ব্বর্ত্তী মানবীয় মনের উপরেই যে সব মানস-ভূমি তা হতে। এ সব কিছুদূর পর্য্যন্ত বেশ উৎসাহকর ও সন্তোষ-জনক হতে পারে—যারা ঐ সকল ভূমিতে কোনরকম অধ্যাত্ম সিদ্ধি চায় তাদের পক্ষে এ সব শ্রেয়স্কর। কিন্তু অতিমানস সিদ্ধির দাবি

অনেক বেশি কঠোর; তাদের পুরোপুরি মিটানও কঠিন—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হল অতিমানসকে শারীর ভূমিতে পর্য্যন্ত নামিয়ে আনা।

*
* *

বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে অনেক সময় দরকার। কিন্তু একবার যদি তাকে প্রকৃতি হতে বহিষ্কার করতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে এ একটা শক্তি বাহিরে থেকে এসে প্রাণের ও শরীরের মধ্যে তার নখরদন্ত প্রবেশ করিয়ে দেয়, তা হলে ও-রকম বহিঃশত্রুকে হটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে। তুমি কিন্তু তাকে নিজের অঙ্গীভূত, তোমার ভিতরে প্রোথিত বলে অনুভব করতে অত্যন্ত অভ্যস্ত—সেই জন্থেই তার ক্রিয়াবলীকে শায়েস্তা করা, তোমার উপর তার সুপ্রাচীন আধিপত্য দূর করা তোমার পক্ষে দুরূহতর হয়ে পড়ে।

আর-কোন জিনিষেরই উপর একান্তভাবে নির্ভর করবে না, তা যতই সহায় বলে মনে হোক না—প্রধানতঃ, প্রথমতঃ মূলতঃ নির্ভর করবে মায়ের শক্তির উপর। সূর্য্য বা আলোক সহায় হতে পারে, সহায় হয়ও, যদি তা সত্যকার সূর্য্য ও সত্যকার আলোক হয়, তবুও তারা মাতৃশক্তির স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

*
* *

সাধকের প্রয়োজনীয় জিনিষ যথাসম্ভব অল্প হবে—কারণ খুব অল্প কয়েকটি জিনিষই জীবনে সত্য-সত্য প্রয়োজন হয়। অবশিষ্ট সব সুবিধার জন্য অথবা প্রসাধনের জন্য অথবা বিলাসের জন্য। এ জাতীয় জিনিষের স্বত্বাধিকার ও ভোগাধিকার সাধকের হয় এই দুয়ের এক অবস্থায়—

(১) যদি সাধন-কালে জিনিষ সে ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্যে যাতে নিরাসক্ত ও নিষ্কাম ভাবে জিনিষের অধিকারী হওয়ার অভ্যাস

তার হয়, যাতে সে শিক্ষা করতে পারে কি রকমে জিনিষ যথাযথভাবে ভাগবত ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করা যায়, তাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়, তাদের দেওয়া যায় একটা উপযুক্ত সংগঠন, শৃঙ্খলা ও পরিমিতি।

অথবা, (২) যদি বাসনা ও আসক্তি হতে তার সত্যকার মুক্তি লাভ হয়ে গিয়ে থাকে, এখন আর জিনিষের ক্ষতি, অভাব বা প্রত্যাহার তাকে কিছুমাত্র স্পর্শ না করে বা বিচলিত না করে। কিন্তু যদি অধিকার বা ভোগের জন্য কোন লোভ, কামনা, আবদার, দাবি থাকে, না পেলে বা বঞ্চিত হলে আসে উৎকণ্ঠা, শোক, ক্রোধ বা বিরক্তি, তবে তার চেতনা মুক্ত নয়, যে-সব জিনিষ তার অধিকারে রয়েছে তাদের ব্যবহার তার পক্ষে সাধনার অন্তরায়। আর চেতনায় যদিও বা মুক্তই হয়, তবু জিনিষ অধিকারে রাখার উপযুক্ত সে হবে না, যদি সে শিক্ষা না করে কি রকমে জিনিষকে নিজের জন্য নয়, ভাগবত ইচ্ছা অনুসারে, তার যন্ত্র হয়ে, ব্যবহারে যথাযথ জ্ঞান ও প্রয়োগকৌশল নিয়ে, আপনার সেবার জন্য নয় ভগবানের সেবার জন্য ও ভগবানের মধ্যে জীবন-যাপনের উপযোগী আয়োজন হিসাবে, ব্যবহার করা যায়।

*
* *

তপস্যার জন্য তপস্যা এ যোগের আদর্শ নয়, তবে প্রাণের ক্ষেত্রে আত্মসংযম এবং স্থূল বাস্তবে যথাযথ শৃঙ্খলা তার একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ—আর আমাদের আদর্শের পক্ষে সত্যকার সংযমে শৈথিল্য বা অভাব অপেক্ষা বরং তপস্যার কঠোরতা শ্রেয়স্কর। স্থূল বাস্তবের উপর আধিপত্য অর্থ নয় প্রচুর আয় আর প্রচুর অপব্যয় কিম্বা যত্র আয় তত্র বা তদপেক্ষা দ্রুততর অপচয়—সে আধিপত্যের মধ্যে রয়েছে জিনিষের সুনিপুণ সুব্যবহার আর তাদের ব্যবহারে একটা আত্মসংযম।

*
* *

যদি যোগসাধনা করতে চাও, তবে ছোট হোক বড় হোক সব বিষয়ে ক্রমে অধিকতর সাধকোচিত ভাব গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সাধনায় বাসনার ক্ষেত্রে সে ভাবটি হল জোর করে দমন নয়, তা হল অনাসক্তি ও সমতা। জোর করে দমন (উপবাস এ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত) অবাধ ভোগেরই সাথে সমান স্তরে। উভয় ক্ষেত্রেই বাসনা থেকে যায়—একটিতে ভোগে সে পুষ্ট হয়, আর একটিতে দমনের ফলে উগ্রভাবে ও গুপ্তরূপে বর্ত্তমান থাকে। কেবল যখন পিছনে সরে দাঁড়ান যায়, নিম্নতন প্রাণ হতে নিজেকে পৃথক করা যায়, তার বাসনা ও বুভুক্ষারাশি নিজের ব'লে কখন স্বীকার করা না যায়, এদের সম্বন্ধে চেতনায় পূর্ণ সমতা ও স্থিরতা অভ্যাস করা যায়, তবেই নিম্নতন প্রাণ নিজেও ক্রমে শুদ্ধ হতে থাকে, নিজেও হয় সম ও স্থির। বাসনার প্রত্যেকটি তরঙ্গ যেমন আসে তেমনি পর্য্যবেক্ষণ করে যেতে হবে, তোমার বাহিরে যে জিনিষ ঘটে তাকে যেমন তুমি দেখ ঠিক তেমনি শান্তভাবে, ঠিক ততখানি অটল অনাসক্ত থেকে—তাকে কখন ধরে রাখবে না, চলে যেতে দেবে, চেতনা থেকে যেন বহিষ্কৃত হয়, আর সেই সঙ্গেই তার স্থানে ক্রমে সত্য ক্রিয়াটি, সত্য চেতনাটি স্থাপন করবে।

*

* *

আহারের উপর আসক্তি, তার জন্য লোভ ও ব্যগ্রতা, জীবনের মধ্যে তাকে একটা অত্যধিক বড় জিনিষ করে তোলা—এ হল যোগবৃত্তির বিরোধী। নতুবা রসনার পক্ষে কোন জিনিষ যদি তৃপ্তিকর হয় তার জ্ঞান থাকা দোষের নয়—কিন্তু দেখা দরকার তার জন্য যেন কোন বাসনা বা উৎকণ্ঠা না থাকে, লাভে উল্লাস, অলাভে নিরানন্দ বা অনুশোচনা না থাকে। আহার যদি সুস্বাদু না হয়, প্রচুর না হয় তবে তাতে বিচলিত বা অসন্তুষ্ট না হয়ে, থাকবে স্থির ও সম—যতটুকু প্রয়োজন সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আহার

করবে, বেশিও নয়, কমও নয়। ব্যগ্রতাও থাকবে না, বিরক্তিও থাকবে না।

সদা-সর্ব্বদা আহার সম্বন্ধে চিন্তা করা, তাই নিয়ে মনকে বিব্রত রাখা আহার-লিপ্সাকে দূর করার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথ। আহার বিষয়টির জীবনের মধ্যে যে যথাযথ স্থান—ক্ষুদ্র একটি কোণ—সেখানে রেখে দাও—ও বিষয়ে মনঃসংযোগ না করে, অন্য বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ কর।

*
* *

আহার নিয়ে মনকে ব্যস্ত করে তুলো না। আহার করবে যথাযথ পরিমাণে (অত্যধিক নয়, অত্যল্পও নয়), তাতে লোভও থাকবে না ঘৃণাও থাকবে না, শরীর রক্ষার জন্য মায়ের দেওয়া উপায় হিসাবে যথাযথ ভাবটি নিয়ে—তোমার মধ্যে যে ভগবান তাকে অর্পণ ক'রে। এ রকমে চললে তামসিকতা আসবে না।

*
* *

স্বাদকে—রসবোধকে—সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে হবে, এ যোগে এমন কথা বলে না। দূর করতে হবে প্রাণের বাসনা ও আসক্তি, আহারের উপর লোভ, পছন্দমত আহার পেলে অতি হর্ষ আর না পেলে বিমর্ষ ও অসন্তোষ, আহারকে অযথা প্রাধান্য দেওয়া। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মত এখানেও সমতাই কষ্টিপাথর।

*
* *

আহার ত্যাগ করবার অভিলাষ হল একটা দুষ্প্রেরণা। অল্প কিছু আহার করে তুমি থাকতে পার, কিন্তু বিনা আহারে থাকতে পারা যায় না, অবশ্য এক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের জন্য ছাড়া। মনে রেখ গীতার কথা—"যে অতিরিক্ত আহার করে আর যে আদৌ আহার

করে না, এদের কারোর জন্যেই যোগ নয়।" প্রাণশক্তি হল এক জিনিষ—বিনা আহারে তাকে বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করা যায়, এমন কি উপবাসে তা বৃদ্ধিই পায়; কিন্তু দেহের স্থূল উপাদান আর এক জিনিষ—এই স্থূলদেহ না থাকলে প্রাণের অবলম্বনও থাকে না।

*
* *

প্রকৃতির এই বৃত্তিটি (আহারলিপ্সা) অবহেলা করবে না, কিম্বা তাকে অতিরিক্ত বড়ও করে তুলবে না—এর সাথে বোঝাপড়া করতে হবে, একে শুদ্ধ করতে হবে, বশে আনতে হবে, তবে অতিশয় প্রাধান্য কিছু না দিয়ে। দুই উপায়ে একে জয় করা যায়—এক, অনাসক্তির পথ—আহারকে শুধু শারীর প্রয়োজন হিসাবে দেখতে শিক্ষা করা, এখানে পাকস্থলীর ও রসনার যে বাসনাগত তৃপ্তি তার কোন মূল্য না দেওয়া; দ্বিতীয়টি হবে, আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা না রেখে যে কোনও আহার লাভ হয় তাই গ্রহণ করতে পারা, তারই মধ্যে—অন্য লোকে তাকে ভালই বলুক আর খারাপই বলুক দৃক্‌পাত না করে সম-রসকে আহারেরই জন্য আহারের যে রস তা নয়,—বিশ্ব-আনন্দের রসকে উপলব্ধি করা।

*
* *

শরীরকে অবহেলা করা, তাকে ক্ষয় হতে দেওয়া ভুল। শরীর হল সাধনার অবলম্বন, তাকে উপযুক্ত করে রাখতে হবে। তার উপর কোন আসক্তি থাকবে না, তাই বলে আমাদের প্রকৃতির এই যে জড় অংশ তাকে ঘৃণা বা অবহেলাও করবে না।

এ যোগের লক্ষ্য কেবল ঊর্দ্ধতর চেতনার সাথে ঐক্য নয়, পরন্তু সেই চেতনার শক্তি দিয়ে নিম্নতন প্রকৃতির—শারীর প্রকৃতির পর্য্যন্ত রূপান্তর।

আহার করতে হলে আহারের জন্য যে লোভ বা বাসনা থাকা

আবশ্যক তা নয়। যোগী আহার করে বাসনার বশে নয়, শরীর ধারণের জন্য।

*
* *

এ কথা ঠিক যে মন ও স্নায়ু যদি দৃঢ় আর ইচ্ছাশক্তি সতেজ থাকে, তবে উপবাসের ফলে সাময়িক ভাবে একটা আন্তর তেজের ও গ্রহণশীলতার অবস্থা লাভ করা যায়। এ অবস্থা মনের পক্ষে লোভনীয়—তখন ক্ষুধা, দুর্ব্বলতা, পাকস্থলীর গোলযোগ এ সব সাধারণ প্রতিক্রিয়া হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা যায়। তবে শরীর শীর্ণ হয়ে পড়ে; আর স্নায়ুমণ্ডলী যতদিন আত্মসাৎ করতে পারে বা সমন্বয় করতে পারে তার অতিরিক্ত প্রাণশক্তি সবেগে প্রবেশ করার ফলে প্রাণের একটা দুঃস্থ শ্রান্ত অবস্থা সহজেই এসে দেখা দিতে পারে। যাদের স্নায়ু দুর্ব্বল তাদের উপবাস-লোভ সংবরণ করা উচিত, তাদের ক্ষেত্রে উপবাসের সঙ্গে সঙ্গে বা পরেই অনেক সময় মনের ভ্রান্তি ও অপ্রকৃতিস্থতা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ তার মধ্যে যদি প্রয়োপবেশনের ভাব থাকে বা এসে প্রবেশ করে তবে উপবাস বিপজ্জনক হয়ে পড়ে—কারণ উপবাস তখন হয় একটা অশুদ্ধ প্রাণবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া, আর তা সাধনার ক্ষতি করে ও অবনতি ঘটায় এমন এক অভ্যাসে সহজেই পরিণত হতে পারে। এ সব প্রতিক্রিয়াও যদি পরিহার করা যায়, তবু উপবাসের যথেষ্ট উপকারিতা নাই—কারণ উর্দ্ধতর তেজ ও গ্রহণসামর্থ্য আসা উচিত কৃত্রিম বা স্থূল-ভৌতিক উপায়ে নয়, পরন্তু চেতনার তীব্রতা আর সাধনার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পের সহায়ে।

*
* *

যে রূপান্তর আমাদের সাধনার লক্ষ্য তা এত বিশাল ও জটিল যে একযোগে তার সমস্তখানি আসতে পারে না—তাকে আসতে

দিতে হবে ধাপের পর ধাপ অনুসরণ করে। শারীর পরিবর্ত্তন হল সর্ব্বশেষ ধাপে—কিন্তু সে ধাপটির মধ্যেও আছে আবার একটা ক্রমোন্নতির ধারা।

আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন ভাবমুখী হোক আর অভাবমুখী হোক কোন স্থূল শারীর উপায়ের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। বরঞ্চ শারীর পরিবর্ত্তনটিই সংসাধিত হতে পারে কেবল তখন যখন শারীর কোষের মধ্যে সেই মহত্তর অতিমানস চেতনার অবতরণ হয়। যতদিন তা না হয় অন্ততঃ ততদিন আংশিকভাবে আহার নিদ্রা প্রভৃতি সাধারণ উপায়ের দ্বারা শরীরকে এবং শরীরের অবলম্বন যে সব শক্তি তাদের ভরণ-পোষণ করতে হবে। আহার করতে হবে, তবে যথাযথ মনোভাবটি রেখে, যথাযথ চেতনা নিয়ে; আর নিদ্রাকে ক্রমে যোগস্থ বিশ্রান্তিতে পরিণত করতে হবে। অকালিক ও অত্যধিক শারীর কৃচ্ছ্রতা (তপস্যা) আধারের বিভিন্ন অঙ্গের শক্তি সকলের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতা এনে দিয়ে সাধনার ধারায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। তাতে মনোময় ও প্রাণময় অংশে একটা বিপুল শক্তি-প্রবাহ প্রবেশ করতে পারে বটে, কিন্তু ফলে স্নায়ুরাজি ও শরীর শ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে আর ঐ সকল উর্দ্ধতর শক্তির ক্রিয়া ধারণ করবার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলতে পারে। ঠিক এই কারণেই অতিমাত্রায় শারীর তপস্যা এখানকার সাধনার মূলধারার অঙ্গীভূত করা হয় নাই।

মাঝে মাঝে দুএক দিনের জন্য উপবাস দিলে অথবা আহার অনেক কমিয়ে দিয়ে অথচ উচিত মাত্রায় নিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য সম্পূর্ণ অনাহার বাঞ্ছনীয় নয়।

*
* *

প্রাণের ও শরীরের উপর কামাবেগের আক্রমণ হতে সাধককে সম্পূর্ণ ঘুরে সরে দাঁড়াতে হবে। কারণ কামাবেগ যদি সে জয় না

করে তবে শরীরের মধ্যে দিব্য চেতনা ও দিব্য আনন্দ স্থিতি লাভ করতে পারবে না।

*
* *

এ কথা সত্য, বাসনাকে কেবল দমন করা বা চেপে রাখা যথেষ্ট নয়—শুধু ঐ টুকুতেই সত্যকার ফল হয় না; কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে বাসনাকে প্রশ্রয় দিতে হবে—তার অর্থ এই, বাসনাকে যে কেবল দমনে রাখতে হবে তা নয়, প্রকৃতির ভিতর থেকে তাকে বহিষ্কৃত করতে হবে। বাসনার পরিবর্ত্তে থাকবে ভগবানের দিকে একমনা আস্পৃহা।

আর ভালবাসার সম্বন্ধে কথা এই যে ভালবাসাকে কেবলমাত্র ভগবানের উপর অর্পণ করতে হবে। মানুষ যে জিনিষটিকে ঐ নামে অভিহিত করে তা হল পরস্পরের বাসনার, প্রাণজ আবেগের বা শারীর ভোগের পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পরের প্রাণের বিনিময়। সাধকদের মধ্যে এ রকম বিনিময় কখন থাকা উচিত নয়—কারণ ও-জিনিষটির সন্ধানে ফিরলে অথবা এ রকম আবেগের প্রশ্রয় দিলে সাধনা থেকে দূরে সরে পড়া ছাড়া আর কিছু ফল হয় না।

*
* *

এ যোগের সমস্ত নীতিই হল একমাত্র ভগবানের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ দিয়ে দেওয়া,—অন্য কারো কাছে, অন্য কিছুর কাছে নয়—আর ভাগবতী মাতৃশক্তির সাথে ঐক্যের ফলে আমাদের ভিতরে ভগবানের অতিমানস স্বরূপের বিশ্বাতীত জ্যোতি, ক্রিয়াশক্তি, বিশালতা, শান্তি, শুচিতা, সত্যময় চেতনা এবং আনন্দকে নামিয়ে আনা। সুতরাং এ যোগে অপরের সাথে প্রাণজ সম্বন্ধ বা আদান-প্রদানের স্থান থাকতে পারে না। এ ধরণের কোন সম্বন্ধ বা আদান-প্রদান অন্তরাত্মাকে তৎক্ষণাৎ নিম্নতন চেতনা ও তার প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ

করে ফেলে, ভগবানের সাথে সত্যকার ও সম্পূর্ণ ঐক্য ঘটতে দেয় না, আর অতিমানস সত্যময় চেতনায় আরোহণ ও অতিমানস ঈশ্বরী শক্তির অবতরণ—উভয়ত্রই বিঘ্ন জন্মায়। ব্যাপারটি আরো খারাপ হয়ে পড়ে যদি এই আদান-প্রদান একটা কামজ সম্বন্ধ বা কামজ সম্ভোগের রূপ নেয়—এমন কি একে স্থূল কোন রকম ক্রিয়া থেকে যদি মুক্ত রাখা যায় সে ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। সুতরাং এ সব জিনিষ সাধনায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য, এ পর্য্যায়ের স্থূল কোন কর্ম্মই অনুমোদিত নয়, তা ছাড়া এর সকল প্রকার সূক্ষ্মতর রূপও পরিহর্ত্তব্য। কেবল যখন আমরা ভগবানের অতিমানস স্বরূপের সাথে একত্ব লাভ করেছি তখন আমরা ভগবানের মধ্যে অপর সকলের সাথে আমাদের যথার্থ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি—সেই উচ্চতর একত্বের মধ্যে এ ধরণের রূঢ় নিম্নতন প্রাণজ ক্রিয়ার স্থান নাই।

কাম-প্রেরণাকে বশীভূত করতে হবে—কামকেন্দ্রকে এতখানি বশে আনতে হবে যে কামজশক্তি বাহিরে নিক্ষিপ্ত ও নষ্ট না হয়ে ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হতে পারে। ফলতঃ ঠিক এই উপায়েই শুক্রের মধ্যে নিহিত শক্তি অপরাপর শক্তির আশ্রয় যে মূল-ভৌতিক শক্তি তাতে পরিণত হয়—রেতঃ হয়ে ওঠে ওজঃ। কিন্তু কামজ বাসনা আর তার কোন সূক্ষ্ম সম্ভোগ সাধনার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা, সাধনার অঙ্গ হিসাবে দেখা, এর চেয়ে দারুণ মারাত্মক ভুল আর কিছু হতে পারে না। আধ্যাত্মিক পতনের দিকে সোজা ছুটে চলবার এটি একেবারে অব্যর্থ উপায়—এতে আবহাওয়ার মধ্যে এমন সব শক্তি এনে ছড়িয়ে দেয় যারা অতিমানসের অবতরণ রুদ্ধ করে ফেলে, পরিবর্ত্তে আনে এমন সব বিরোধী শক্তির অবতরণ যাদের কাজ কেবল বিশৃঙ্খলতা ও বিফলতা পরিবেশন করা। দিব্য সত্যকে যদি নামিয়ে আনতে হয়, দিব্য কর্ম্মটি যদি নিষ্পন্ন করতে হয়, তবে এই বিকৃত গতি যদি কখন এসে পড়তে চায় তবে তাকে একেবারে ঝেড়ে

ফেলে দিতে হবে, চেতনা থেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে হবে।

স্থূলভাবে কামসম্ভোগ পরিত্যাগ করতে ত হবেই, কিন্তু তার কোন আভ্যন্তরীণ প্রতিরূপ কামরূপান্তরের অঙ্গ হবে—এরকম মনে করাও ভ্রান্তি। অজ্ঞানময় স্থূল-সৃষ্টির যে বিধি-ব্যবস্থা তার অন্তর্গত একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের কৌশলমাত্র হল প্রকৃতির মধ্যে এই পাশব কামবেগের ক্রিয়া। কিন্তু এই ক্রিয়ার সাথে সাথে থাকে একটা প্রাণজ উত্তেজনা, আর তাতে আবহাওয়ার মধ্যে এতখানি অনুকূল স্পন্দন ও সুযোগ এনে দেয় যে যে-সব প্রাণময় সত্তা ও শক্তিদের সমস্ত কাজই হল অতিমানস জ্যোতির অবতরণ নিবারণ করা ঠিক তারাই সেখানে সবেগে প্রবেশ করতে পায়। তার সঙ্গে যে সুখানুভূতি সংযুক্ত থাকে তা দিব্য আনন্দের যথার্থ রূপ নয়, একটা বিকৃতি মাত্র। দেহের মধ্যে সত্যকার দিব্য আনন্দের গুণ, গতি, উপকরণ ভিন্ন রকমের—মূলতঃ তা আত্মস্থিত, তার প্রকাশ নির্ভর করে কেবল ভগবানের সাথে একটা আন্তর সম্মিলনের উপর। তুমি দিব্য প্রেমের কথা উল্লেখ করেছ—কিন্তু দিব্য প্রেম শরীরকে স্পর্শ করলে সেখানে স্থূল নিম্নতন প্রাণজ প্রবৃত্তি কিছু জাগায় না—এসকলের চরিতার্থতা তাকে কেবল দূরে সরিয়ে দেয়,—যে ঊর্দ্ধলোক থেকে তাকে এই জড়সৃষ্টির রূঢ়তার মধ্যে অবতরণ করানই যথেষ্ট দুরূহ—যদিও জড়কে রূপান্তরিত করা একমাত্র তারই ক্ষমতা,—সেই ঊর্দ্ধলোকেই তাকে আবার ফিরে যেতে বাধ্য করায়। একমাত্র যে দুয়ার দিয়ে দিব্য প্রেম প্রবেশ করতে সম্মত, সেই চৈত্যপুরুষের দুয়ার দিয়েই তার অনুসরণে চল, আর এই নিম্নতন প্রাণজ ভ্রান্তি দূর করে দাও।

শারীর সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন কামকেন্দ্র ও তার ক্রিয়াশক্তির রূপান্তর—কারণ আধারের মনোময় প্রাণময় অন্নময় যত শক্তি শরীরের মধ্যে তাদের অবলম্বন হল ঐ জিনিষটিই। একে অন্তরঙ্গ জ্যোতির, সৃজনী শক্তির, বিশুদ্ধ দিব্য আনন্দের সম্ভারে ও প্রবাহে পরিণত করতে হবে। এ কেন্দ্রের রূপান্তর হতে পারে এর মধ্যে একমাত্র অতিমানস জ্যোতি, শক্তি ও

আনন্দের অবতরণে। পরে তার ক্রিয়া কি রকম হবে তা অতিমানস সত্য আর ভাগবতী জননীর সৃজনী দৃষ্টি ও ইচ্ছাশক্তিই নিরূপণ করে দেবে। তবে তা হবে সচেতন সত্যের ক্রিয়া, কামজ বাসনা ও সম্ভোগ যার অন্তর্গত সেই তমিস্রার ও অজ্ঞানের ক্রিয়া নয়। তা হবে সংরক্ষণের শক্তি, জীবনীশক্তি-সকলের মুক্ত বাসনাশূন্য বিকিরণ, তাদের বিক্ষেপ ও অপচয় নয়। এ কল্পনা পরিহার করবে যে, অতিমানস জীবন হবে প্রাণের ও দেহের বাসনারাজিরই একটা সমুন্নত পর্য্যায়ের তৃপ্তিমাত্র। মানব প্রকৃতির মধ্যে পশুর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার এই যে প্রত্যাশা—এর অপেক্ষা ভাগবত সত্যের অবতরণের পক্ষে গুরুতর প্রতিবন্ধক নাই। মন চায় অতিমানস অবস্থা হোক তার নিজের প্রিয় ধারণার ও সংস্কারের সমর্থন ; প্রাণ চায় তা হোক তার বাসনারাজির এক মহিমাময় সংস্করণ ; দেহ চায় সে হোক তার নিজের সুখের আরামের অভ্যাসের এক সমৃদ্ধ অনুবৃত্তি। তাকে যদি এই হতে হয় তবে সে হবে কেবল পাশব ও মানব প্রকৃতিরই একটা অতিপুষ্ট আত্যন্তিক স্ফীত পরিণতি, মানব হতে ভাগবতে পরিবর্ত্তন তা নয়।

তোমার মধ্যে "যে জিনিষটি অবতরণ করতে চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে বিচারের ও আত্মরক্ষার কোনরকম বাধা" তুমি স্থাপন করবে না বলে যে মনস্থ করছ তা বিপদের কথা। যে জিনিষ নেমে আসছে তা যদি দিব্য সত্যের অনুকূল না হয়, বরং হয় প্রতিকূল, তবে কি ভেবে দেখেছ তোমার ও-কথার অর্থ কি ? প্রতিকূল শক্তি সাধকের উপর অধিকার লাভের জন্য এর চেয়ে ভাল সুযোগ আকাঙ্ক্ষা করে না। বিনা বাধায় আসতে দিতে হবে কেবল এক মাতৃশক্তিকে ও ভাগবত সত্যকে। এখানেও বিচারক্ষমতাকে সামনে রাখবে যাতে মায়ের শক্তি ও ভাগবত সত্যের মুখোস পরে যদি আসে কোন মিথ্যা, তবে তাকে ধরে ফেলতে পার—আর সেই সাথে প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতাও সজাগ রাখবে যাতে সকল মিশ্র জিনিষ ঝেড়ে ফেলে দিতে পার।

তোমার যে অবশ্যম্ভাবী আধ্যাত্মিক ভবিতব্য তাতে শ্রদ্ধা রাখ, ভ্রান্তি থেকে সরে দাঁড়াও, মায়ের জ্যোতি ও শক্তির যে সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ

তার কাছে তোমার চৈত্যসত্তাকে আরো খুলে ধর। তোমার সঙ্কল্পটি যদি আন্তরিক হয় তবে প্রতিবারেই ভুল-স্বীকার একটা সত্যতর গতি ও ঊর্দ্ধতর উন্নতির সোপান হয়ে উঠতে পারে।

*
* *

আমার পূর্ব্বপত্রে কামবেগ ও যোগসাধনা সম্বন্ধে জিনিষটি আমি কি ভাবে দেখি তা ব্যক্ত করেছি। এখানে আরো বলতে পারি যে আমার সিদ্ধান্ত কোন মানসিক অভিমত বা পূর্ব্বকল্পিত নৈতিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা প্রতিষ্ঠিত প্রামাণ্য বস্তু ও ঘটনার উপর, পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর। আমি অস্বীকার করি না যে যতদিন আন্তর অভিজ্ঞতা আর বাহ্য চেতনার মধ্যে একটা ভেদ রেখে দেওয়া হয়, শেষোক্ত জিনিষটিকে একটা ইতর ক্রিয়া হিসাবে দমনে রাখা হয় কিন্তু রূপান্তরিত করা না হয়, ততদিন কামজ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিরতি না হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতা অনেক লাভ হতে পারে, সাধনায় উন্নতিও করা যেতে পারে। মন তখন নিজেকে বাহ্য-প্রাণময় (জীবনীশক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যে অংশ) ও অন্নময় চেতনা হতে পৃথক করে নিজের অন্তঃস্থ জীবন যাপন করে। কিন্তু অতি অল্প লোকে সত্য-সত্যই পুরোপুরি ভাবে এ-কাজটি করতে সক্ষম, যে মুহূর্ত্তে অনুভূতি প্রাণের ও দেহের ক্ষেত্র অবধি প্রসারিত হয়, তখন থেকে কাম-প্রবৃত্তিকে আর ও-ভাবে গ্রহণ করা চলে না। যে-কোন মুহূর্ত্তে তা বিঘ্নের বিপর্য্যয়ের বিকৃতির শক্তি হয়ে উঠতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি অহংকার (দর্প, দম্ভ, দুরাকাঙ্ক্ষা) আর রাজসিক সব ক্ষুধা ও বাসনার মত, ঠিক সমান মাত্রায়, ঐ জিনিষটিও সাধনায় পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। একে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলে না দিয়ে উদাসীন থেকে এর সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা ব্যর্থই হয়। ইউরোপের অনেক আধুনিক অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু এর ঊর্দ্ধায়নের চেষ্টা করবার পক্ষপাতী—কিন্তু সে পরীক্ষা যেমন দুঃসাহসপ্রসূত তেমনি বিপদপূর্ণ। কারণ কামবৃত্তি আর আধ্যাত্মিকতাকে যখন মিশিয়ে ফেলা হয় তখনই ঘটে সবচেয়ে বেশী

সর্ব্বনাশ। এমন কি, বৈষ্ণব "মধুরভাবে" যেমন করা হয় সেই রকমে, বৃত্তিটিকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করবার চেষ্টার মধ্যেও থেকে যায় একটা বিপদ—এ পন্থায় একটু অপগতি বা অপপ্রয়োগের কি ফল তা বারবার দেখা গিয়েছে। যা হোক, আমাদের যোগে আমরা কেবল ভগবানের মূল উপলব্ধিটি চাই না, চাই সমগ্র সত্তার ও স্বভাবের রূপান্তর; এ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে কামশক্তির উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব সাধনার অপরিহার্য্য লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। নতুবা প্রাণ-চেতনা একটা আবিল মিশ্র বস্তুরূপে থেকে যায়, আর সে আবিলতা অধ্যাত্ম-ভাবিত মনের শুদ্ধতাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং শরীরস্থ শক্তিসকলের ঊর্দ্ধমুখী প্রবণতাকেও বিশেষভাবে ব্যাহত করে। এ যোগের দাবি সমগ্র নিম্নতন অর্থাৎ সাধারণ চেতনার পূর্ণ উত্তরণ, যাতে সে-চেতনা তার উপরস্থ অধ্যাত্ম-চেতনার সাথে সংযুক্ত হতে পারে, আর মনের, প্রাণের ও দেহের মধ্যে, এদের রূপান্তর সাধনের জন্য, অধ্যাত্মের (পরিশেষে অতিমানসের) পূর্ণ অবতরণ। কাম-বাসনা যতদিন পথ রুদ্ধ ক'রে থাকে ততদিন পরিপূর্ণ উত্তরণ অসম্ভব; কাম-বাসনা প্রাণে যতদিন প্রবল ততদিন অবতরণ বিপজ্জনক। কারণ যে-কোন মুহূর্ত্তে অনুৎপাটিত বা সুপ্ত কাম-বাসনা এমন মলিনতা সৃষ্টি করতে পারে যা সত্যকার অবতরণকে ঠেলে ফিরিয়ে দেয়, অর্জ্জিত শক্তিকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অথবা চেতনার সব-কিছু ক্রিয়াকেই একটা আবিল ও মোহকর ভ্রান্ত অভিজ্ঞতার দিকে চালিত করে। সুতরাং এই বাধাটিকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, নতুবা সাধনা নির্ব্বিঘ্ন কিম্বা সিদ্ধির দিকে গতি মুক্ত হতে পারে না।

তুমি যে বিপরীত মতটির কথা বলছ তা এই ধারণা হতে আসতে পারে, যে, কামবৃত্তি প্রাণমন গঠিত মানবাধারের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ, আহার ও নিদ্রারই মত একটা অবশ্য প্রয়োজন, আর তার সম্পূর্ণ নিবৃত্তির ফলে অপ্রকৃতিস্থতা এবং অন্য সব বিষম বিপত্তি ঘটতে পারে। এ কথা সত্য, কামবৃত্তি বাহিরে

তার কাছে তোমার চৈত্যসত্তাকে আরো খুলে ধর। তোমার সঙ্কল্পটি যদি আন্তরিক হয় তবে প্রতিবারেই ভুল-স্বীকার একটা সত্যতর গতি ও ঊর্দ্ধতর উন্নতির সোপান হয়ে উঠতে পারে।

*

* *

আমার পূর্ব্বপত্রে কামবেগ ও যোগসাধনা সম্বন্ধে জিনিষটি আমি কি ভাবে দেখি তা ব্যক্ত করেছি। এখানে আরো বলতে পারি যে আমার সিদ্ধান্ত কোন মানসিক অভিমত বা পূর্ব্বকল্পিত নৈতিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা প্রতিষ্ঠিত প্রামাণ্য বস্তু ও ঘটনার উপর, পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর। আমি অস্বীকার করি না যে যতদিন আন্তর অভিজ্ঞতা আর বাহ্য চেতনার মধ্যে একটা ভেদ রেখে দেওয়া হয়, শেষোক্ত জিনিষটিকে একটা ইতর ক্রিয়া হিসাবে দমনে রাখা হয় কিন্তু রূপান্তরিত করা না হয়, ততদিন কামজ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিরতি না হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতা অনেক লাভ হতে পারে, সাধনায় উন্নতিও করা যেতে পারে। মন তখন নিজেকে বাহ্য-প্রাণময় (জীবনীশক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যে অংশ) ও অন্নময় চেতনা হতে পৃথক করে নিজের অন্তঃস্থ জীবন যাপন করে। কিন্তু অতি অল্প লোকে সত্য-সত্যই পুরোপুরি ভাবে এ-কাজটি করতে সক্ষম, যে মুহূর্ত্তে অনুভূতি প্রাণের ও দেহের ক্ষেত্র অবধি প্রসারিত হয়, তখন থেকে কাম-প্রবৃত্তিকে আর ও-ভাবে গ্রহণ করা চলে না। যে-কোন মুহূর্ত্তে তা বিঘ্নের বিপর্য্যয়ের বিকৃতির শক্তি হয়ে উঠতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি অহংকার (দর্প, দম্ভ, দুরাকাঙ্ক্ষা) আর রাজসিক সব ক্ষুধা ও বাসনার মত, ঠিক সমান মাত্রায়, ঐ জিনিষটিও সাধনায় পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। একে সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলে না দিয়ে উদাসীন থেকে এর সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা ব্যর্থই হয়। ইউরোপের অনেক আধুনিক অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু এর ঊর্দ্ধায়নের চেষ্টা করবার পক্ষপাতী—কিন্তু সে পরীক্ষা যেমন দুঃসাহসপ্রসূত তেমনি বিপদপূর্ণ। কারণ কামবৃত্তি আর আধ্যাত্মিকতাকে যখন মিশিয়ে ফেলা হয় তখনই ঘটে সবচেয়ে বেশী

সর্ব্বনাশ। এমন কি, বৈষ্ণব "মধুরভাবে" যেমন করা হয় সেই রকমে, বৃত্তিটিকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করবার চেষ্টার মধ্যেও থেকে যায় একটা বিপদ—এ পন্থায় একটু অপগতি বা অপপ্রয়োগের কি ফল তা বারবার দেখা গিয়েছে। যা হোক, আমাদের যোগে আমরা কেবল ভগবানের মূল উপলব্ধিটি চাই না, চাই সমগ্র সত্তার ও স্বভাবের রূপান্তর; এ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে কামশক্তির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সাধনার অপরিহার্য্য লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। নতুবা প্রাণ-চেতনা একটা আবিল মিশ্র বস্তুরূপে থেকে যায়, আর সে আবিলতা অধ্যাত্ম-ভাবিত মনের শুদ্ধতাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং শরীরস্থ শক্তিসকলের ঊর্দ্ধমুখী প্রবণতাকেও বিশেষভাবে ব্যাহত করে। এ যোগের দাবি সমগ্র নিম্নতন অর্থাৎ সাধারণ চেতনার পূর্ণ উত্তরণ, যাতে সে-চেতনা তার উপরস্থ অধ্যাত্ম-চেতনার সাথে সংযুক্ত হতে পারে, আর মনের, প্রাণের ও দেহের মধ্যে, এদের রূপান্তর সাধনের জন্য, অধ্যাত্মের (পরিশেষে অতিমানসের) পূর্ণ অবতরণ। কাম-বাসনা যতদিন পথ রুদ্ধ ক'রে থাকে ততদিন পরিপূর্ণ উত্তরণ অসম্ভব; কাম-বাসনা প্রাণে যতদিন প্রবল ততদিন অবতরণ বিপজ্জনক। কারণ যে-কোন মুহূর্ত্তে অনুৎপাটিত বা সুপ্ত কাম-বাসনা এমন মলিনতা সৃষ্টি করতে পারে যা সত্যকার অবতরণকে ঠেলে ফিরিয়ে দেয়, অর্জ্জিত শক্তিকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অথবা চেতনার সব-কিছু ক্রিয়াকেই একটা আবিল ও মোহকর ভ্রান্ত অভিজ্ঞতার দিকে চালিত করে। সুতরাং এই বাধাটিকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, নতুবা সাধনা নির্ব্বিঘ্ন কিম্বা সিদ্ধির দিকে গতি মুক্ত হতে পারে না।

তুমি যে বিপরীত মতটির কথা বলছ তা এই ধারণা হতে আসতে পারে, যে, কামবৃত্তি প্রাণমন গঠিত মানবাধারের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ, আহার ও নিদ্রারই মত একটা অবশ্য প্রয়োজন, আর তার সম্পূর্ণ নিবৃত্তির ফলে অপ্রকৃতিস্থতা এবং অন্য সব বিষম বিপত্তি ঘটতে পারে। এ কথা সত্য, কামবৃত্তি বাহিরে

কার্য্যতঃ দমন ক'রে অন্তভাবে উপভোগ করলে তাতে আধারে একটা গোলমাল ও মস্তিষ্কের অসুস্থতা ঘটায়। কাম-উপরতিকে এক ডাক্তারী মত যে সমর্থন করে না, তার মূল হেতু এইখানে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, এ সব জিনিষ ঘটে তখনি কেবল যখন স্বাভাবিক কাম-সম্ভোগের স্থান গ্রহণ করে একটা বিকৃত ধরণের গোপন সম্ভোগ অথবা কল্পনায়, সূক্ষ্ম-প্রাণের আশ্রয়ে একটা সম্ভোগ অথবা প্রাণের একটা অদৃশ্য প্রচ্ছন্ন আদান-প্রদান ধ'রে সম্ভোগ। আমি মনে করি না এ বিষয়ে পূর্ণ-জয়ের ও উপরতির জন্য যদি সত্যকার অধ্যাত্ম-প্রয়াস থাকে তবে কখন তাতে কিছু অনিষ্ট হয়। ইউরোপে এখন অনেক চিকিৎসক এই মত পোষণ করেন যে কামোপরতির ফল ভালই যদি তা খাঁটি হয়; রেতোমধ্যস্থ যে বস্তুটি কামক্রিয়ায় ব্যয়িত হয় তা পরিণত হয় রেতোমধ্যস্থ আর একটি বস্তু, যা আধারের, মনের, প্রাণের ও দেহের, শক্তিরাজির আহার্য্য যোগায়—এ হতেই ভারতীয় ব্রহ্মচর্য্যবাদের সত্যতা প্রমাণ হয়; ব্রহ্মচর্য্য হল রেতঃকে ওজঃরূপে পরিণত করা, রেতঃস্থ তেজসকলকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরা, যাতে তারা একটা অধ্যাত্মশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

জয়ের উপায় সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে কেবল বাহ্য উপরতি দিয়ে তা সম্ভব নয়—সে উপায়ের ধারা হল অনাসক্তি ও প্রত্যাখ্যানের যুগপৎ ক্রিয়া। চেতনা কামবেগ হতে দূরে সরে দাঁড়ায়, অনুভব করে বৃত্তিটি তার নিজের নয়, প্রকৃতি-শক্তি বাহির হতে এনে তার উপর ফেলে দিয়েছে, কিন্তু তাতে সে সম্মতি দেয় না, তার সাথে আপনাকে এক ক'রে ফেলে না। যতবার সে প্রত্যাখ্যান করে তত বেশি বৃত্তিটি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। মন নির্লিপ্ত থাকে; পরে প্রধান অবলম্বন যে প্রাণপুরুষ তাও ঐ ভাবে সরে দাঁড়ায়, শেষে শারীর চেতনা পর্য্যন্ত তাকে আর আশ্রয় দেয় না। এই ধারায় কাজ চলতে থাকে যতদিনে অবচেতনাও আর তাকে স্বপ্নের মধ্যে জাগিয়ে তোলে না এবং বাহ্য প্রকৃতি শক্তি হতেও কোন আবেগ এসে আর এই নিম্নতন

অগ্নিকে পুনঃ প্রজ্জলিত করে না। কামপ্রবৃত্তিটি যেখানে অত্যন্ত দৃঢ়মূল সেখানে এই পথ অনুসরণীয়; অন্যথা, এমনও কেহ কেহ আছে যারা তাদের প্রকৃতি হতে এ বৃত্তিটিকে বিশেষ ক্ষিপ্রতার সাথে নিঃশেষ নিষ্কাশিত ক'রে এর পূর্ণ নিবৃত্তি সাধন করেন—তবে এ রকম সচরাচর হয় না।

এ কথা বলা প্রয়োজন যে কামপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি সাধনার একটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ অঙ্গ, এতে সময়ের দরকার এবং সে জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এর পূর্ণ বিলুপ্তি সত্যই যে হয় তা দেখা যায়; এ ছাড়া কার্য্যতঃ এক বিমুক্তি—শুধু মাঝে মাঝে অবচেতন হতে উত্থিত দুষ্ট-স্বপ্ন তাকে খণ্ডিত করলেও—অনেকেই লাভ করে থাকে।

*
* *

কামবেগের কথা। জিনিষটিকে পাপ, বিভীষিকা অথচ লোভনীয় কিছু হিসাবে দেখবে না, দেখবে নিম্নতন প্রকৃতির একটা ভুল, একটা ভ্রান্ত-ক্রিয়া হিসাবে। একে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করবে —তবে এর সঙ্গে যুদ্ধ করে নয়, এর থেকে সরে দাঁড়িয়ে, নিজেকে পৃথক করে নিয়ে, তোমার সম্মতি না দিয়ে—একে এই ভাবে দেখবে যে এ জিনিষ তোমার কিছু নয়, তোমার বাহিরে একটা প্রকৃতির শক্তি একে তোমার উপর আরোপ করে দিয়েছে। এ আরোপে আদৌ সম্মতি দেবে না। তোমার প্রাণসত্তার কোথাও কিছু যদি সম্মতি দেয়, তবে সে অঙ্গটির উপর জোর করবে যাতে তার সম্মতি সে প্রত্যাহার করে। তোমার এই প্রত্যাহার ও প্রত্যাখ্যানের কাজে সহায়তার জন্য ভাগবতী শক্তিকে ডেকে আন। যদি স্থিরভাবে দৃঢ়ভাবে ধৈর্য্যের সাথে কাজটি করতে পার তবে পরিশেষে বাহ্য-প্রকৃতির এ অভ্যাসটির উপর তোমার আভ্যন্তরীণ সঙ্কল্পই জয়ী হবে।

*
* *

এতখানি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বার বা সাধনা বিফল হল বলে জল্পনা-কল্পনা করবার কোন কারণ নাই। তুমি যে যোগসাধনার অনুপযুক্ত তার লক্ষণ মোটেও এ জিনিষ নয়—এর অর্থ কামবেগ সচেতন অংশ থেকে বিতাড়িত হয়ে অবচেতনায় আশ্রয় নিয়েছে, খুব সম্ভব নিম্নতন জড়গত-প্রাণের চেতনা বা জড়তম চেতনার মধ্যে কোথাও, যেখানে আস্পৃহার দিকে, জ্যোতির দিকে উন্মুক্ত নয় এমন ক্ষেত্র সব এখনও রয়ে গিয়েছে। জাগ্রত চেতনা থেকে যে সব জিনিষ বহিষ্কৃত, স্বপ্নে তাদের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব—সাধনার ধারায় এটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা।

প্রতিকার হল (১) উপরের চেতনাকে, তার জ্যোতিকে, তার শক্তির ক্রিয়াবলীকে প্রকৃতির তমসাচ্ছন্ন অঙ্গসকলেরও মধ্যে নামিয়ে আনা; (২) সাধনার ক্রিয়া সম্বন্ধে সজ্ঞান এমন এক আভ্যন্তরীণ চেতনায় জাগ্রতের মত সুপ্তিতেও ক্রমে অধিকতর সচেতন হওয়া; (৩) সুপ্তির মধ্যে শরীরকে জাগ্রতের সঙ্কল্প ও আস্পৃহা দিয়ে প্রভাবান্বিত করা।

শেষের কাজটি করার এক উপায়, নিদ্রার ঠিক পূর্ব্বে সজ্ঞানে ও সবলে শরীরের মধ্যে এই ভাবটি প্রবেশ করান যে জিনিষটি আর ঘটবে না—ভাবটি যত বাস্তব ও শরীরী হবে, যতখানি সাক্ষাৎ কামকেন্দ্রের উপর নিবদ্ধ হবে ততই ভাল। ফল প্রথমেই একেবারে আশু বা অব্যর্থ না হতে পারে—কিন্তু এই ধরণের ভাব সঞ্চার যদি তুমি জান কি রকমে করতে হয়, শেষে তা সফল হয়; যদি স্বপ্ন তাতে নিবারিত না হয়, সে ক্ষেত্রেও প্রায়ই সময়মত ভিতরের চেতনাটি জেগে যায়, আর কুফল কিছু হয় না।

সাধনায় বার বার বিফল হলেও নিজেকে অবসাদগ্রস্ত হতে দেওয়া ভুল। স্থির থাকতে হবে, অধ্যবসায়ী হতে হবে, বাধা যত দৃঢ় তার চেয়ে দৃঢ়তর হতে হবে।

*
* *

কামবেগের বিপত্তিটি ক্রমে ক্ষয় পেয়ে যেতে বাধ্য যদি তুমি আন্তরিকভাবে একে ঝেড়ে ফেলতে চাও। কিন্তু মুস্কিল এই যে তোমার প্রকৃতির সেই অঙ্গটি (বিশেষভাবে নিম্নতন প্রাণ আর সুপ্তির মধ্যে সক্রিয় যে অবচেতনা) এ সকল বৃত্তির স্মৃতিকে ও আসক্তিকে ধরে থাকে, তুমি সে সব অংশ খুলে ধর না, শুদ্ধির জন্য মায়ের জ্যোতিকে শক্তিকে তাদের দিয়ে গ্রহণ করাতে পার না। তা যদি করতে, আর কেবলই পরিতাপ না ক'রে, উদ্বিগ্ন না হয়ে, এসব জিনিষ তুমি ঝেড়ে ফেলতে অক্ষম এই ধারণা শক্ত ক'রে না ধরে, তার পরিবর্ত্তে যদি অচঞ্চল শ্রদ্ধা ও ধীর সঙ্কল্প নিয়ে ও-সকলের বিলোপ-সাধনের উপর জোর দিতে, তোমাকে তাদের থেকে পৃথক করে ধরতে, তাদের বরণ করে না নিতে, তাদের তোমার নিজের অঙ্গ বলে দেখতেই অস্বীকার করতে, তা হলে ক্রমে তারা নির্বীর্য্য হয়ে, ক্ষয় পেয়ে যেত।

*

* *

কাম-বিপত্তি গুরুতর হয় ততক্ষণ যতক্ষণ তা মনের ও প্রাণজ সঙ্কল্পের সম্মতি পায়। যদি মন থেকে তাকে বিতাড়িত করা যায়, অর্থাৎ মন যদি সম্মতি না দেয় কিন্তু প্রাণস্তর যদি তাতে সাড়া দেয়, তা হলে সে প্রাণজ বাসনার এক বিপুল তরঙ্গের রূপ নিয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে সবেগে মনকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। উপরিতন প্রাণ হতে, হৃদয় হতে আর কর্ম্মবেগময় স্বত্ব-স্বামিত্ব-কামী জীবনীশক্তি হতেও যদি সে বিতাড়িত হয়, তবে নিম্নতন প্রাণের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেরণা ও প্ররোচনার রূপ নিয়ে দেখা দেয়। নিম্নতন প্রাণস্তর হতে বিতাড়িত হয়ে, তমসাচ্ছন্ন জড়বৎ-পুনরাবৃত্তিপরায়ণ শরীর-স্তরের মধ্যে নেমে যায়, তখন সে দেখা দেয় কামকেন্দ্রে স্থূলস্পন্দন অনুভব করা ও কাম-প্ররোচনায় যন্ত্রের মত সাড়া দেওয়া এই রূপ নিয়ে। সেখান হতেও

যদি বিতাড়িত হয় তবে আরও নেমে যায় অবচেতনার মধ্যে, আর স্বপ্ন হয়ে কিম্বা স্বপ্ন ব্যতিরেকেও স্বপ্নদোষরূপে দেখা দেয়। কিন্তু যেখানেই সে হটে আসুক না, কিছুকালের জন্য অন্ততঃ সে স্থানটিকে তার আশ্রয় বা খুঁটি ক'রে ধ'রে উর্দ্ধতন স্তর সকলকে উদ্বিগ্ন করতে, তাদের সম্মতি পুনরায় অধিকার করতে চেষ্টা করে। এই ধারা চলতে থাকে যতদিন সম্পূর্ণ বিজয় না হয়, যতদিন না সর্ব্ব-সাধারণ প্রকৃতি বা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত যে প্রসারণকে বলা যায় আবেষ্টনী বা পারিপার্শ্বিক চেতনা তা থেকেও ও-জিনিষ বিতাড়িত হয়ে যায়।

*
* *

অন্তঃপুরুষ যখন প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন সকলের আগে তোমার সতর্ক হওয়া উচিত যাতে অন্তঃপুরুষের বৃত্তির সাথে অতি সামান্য পরিমাণেও ভুল প্রাণবৃত্তি মিশ্রিত না হয়। কাম একটা বিকৃতি, অপভ্রংশ—প্রেমের রাজ্য স্থাপনে প্রতিবন্ধক; তাই যখন হৃদয়ে অন্তরাত্মাগত প্রেমের বৃত্তি দেখা দিয়েছে তখন যে জিনিষটি সেখানে আসতে দেওয়া উচিত নয় তা হল কাম বা প্রাণজ বাসনা—ঠিক যে রকমে উপর হতে শক্তি যখন নেমে আসে তখন তা থেকে ব্যক্তিগত পদাকাঙ্ক্ষা ও গর্ব্ব বহুদূরে সরিয়ে রাখা উচিত সেই রকমে। কারণ কোন বিকৃতিতে এনে মিশিয়ে দিলে অন্তরাত্মার বা অধ্যাত্মের ক্রিয়া কলুষিত হয়ে পড়ে ও সত্যকার সিদ্ধি ব্যর্থ হয়।

*
* *

প্রাণায়াম বা আসনের মত আর কোন শারীর ক্রিয়া যে কাম-বাসনাকে নির্ম্মূল করবেই এমন কথা নাই—অনেক সময়ে ঐ সব ক্রিয়া শরীরস্থ প্রাণশক্তিকে এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় যে তাতে কামপ্রবণতার বেগও অপ্রত্যাশিতভাবে অতিবর্দ্ধিত হয়ে

উঠতে পারে ; কামবৃত্তি শরীরগত জীবনের মূলে রয়েছে ব'লে তাকে জয় করা সর্ব্বদাই দুরূহ। সেজন্যে দরকার এই কাজটি—এসব বৃত্তি থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে ধরা, আর নিজের আন্তর আত্মাকে আবিষ্কার ক'রে তার মধ্যে বাস করা—তা হলে তাদের আর নিজের বলে বোধ হবে না, বোধ হবে তারা আন্তর আত্মা বা পুরুষের উপর বাহ্য-প্রকৃতির ভাসা-ভাসা আরোপ। তখন তাদের অপেক্ষাকৃত সহজে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে বা বিলোপও করা যেতে পারে।

*
* *

ঘুমের ভিতর এই ধরণের কামের আক্রমণ আহারের বা বাহ্য কোন কিছুর উপর খুব বেশি নির্ভর করে না। এ হল অবচেতনায় যন্ত্রবৎ পুনরাবর্ত্তিত অভ্যাস। কাম-প্রেরণা যখন জাগ্রতের চিন্তায় বা অনুভব প্রত্যাখ্যাত বা নিষিদ্ধ হয় তখন ঘুমের মধ্যে এইরূপে এসে দেখা দেয় ; কারণ তখন একমাত্র অবচেতনাই সক্রিয় থাকে, জাগ্রতের শাসন সেখানে নাই। এর অর্থ কাম-বাসনা জাগ্রত মনে ও প্রাণে দমিত হয়েছে বটে কিন্তু শারীর-প্রকৃতির নিজস্ব উপাদানে তার লোপ-সাধন হয় নাই।

এই লোপ-সাধনের জন্য প্রথমে সাবধান হওয়া দরকার জাগ্রত অবস্থায় যেন কোন কামাশ্রিত কল্পনা বা অনুভব স্থান না পায় ; তারপর দরকার, শরীরের উপর, বিশেষভাবে কাম-কেন্দ্রের উপর একটা প্রবল সঙ্কল্প প্রয়োগ করা যাতে ঘুমের মধ্যে ও-রকম জিনিষ কিছু না ঘটে। এ চেষ্টা প্রথমেই সফল না হতে পারে কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে যদি লেগে থাকা যায়, তবে সাধারণত ফল হয়—অবচেতনা বশে আসতে থাকে।

*
* *

শরীরকে কষ্ট দেওয়া কামপ্রবৃত্তির প্রতিকার নয়, যদিও তাতে

সাময়িকভাবে জিনিষটিকে একপাশে সরিয়ে রাখা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়ানুভবকে সুখের বা দুঃখের ব'লে গ্রহণ করে যে অঙ্গ তা হল প্রাণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীরাশ্রিত প্রাণ।

আহার কমিয়ে দিলে সচরাচর যে স্থায়ী ফল হয় তা নয়। ওতে শরীরে বা শারীরাশ্রিত প্রাণে একটা অধিকতর শুচিতার ভাব এনে দিতে পারে, আধারকে লঘু করতে পারে, কোন কোন প্রকারের তমঃর পরিমাণকে হ্রাস করতে পারে। কিন্তু কামবৃত্তি স্বল্পাহারের সঙ্গেও বেশ বনিবনাও করে থাকতে পারে। স্থূল উপায় ধরে নয়, চেতনার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের ফলেই এ সব জিনিষ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

*
* *

তোমার প্রকৃতি হতে আদিম জীবটি বহিষ্কার করবার সমস্যা তোমার সমস্যাই রয়ে যাবে, যতদিন একমাত্র অথবা প্রধানতঃ তোমার মনের বা মানস-সঙ্কল্পের জোরে, অধিকপক্ষে একটা অনির্দ্দেশ্য অপৌরুষেয় ভাগবত-শক্তিকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে তুমি তোমার প্রাণের অংশ পরিবর্ত্তন করতে চেষ্টা করবে। সমস্যাটি সুপ্রাচীন, জীবনের ক্ষেত্রে তার সম্যক সমাধান কখন করা হয় নাই, কারণ ঠিকভাবে তার সম্মুখীন হওয়া যায় নাই। অনেক যোগমার্গে এতে খুব বেশি আসে যায় না, কারণ তাদের লক্ষ্য রূপান্তরিত জীবন নয়, জীবন হতে অপসরণ। সাধনার উদ্দেশ্য যখন তাই হয়, তখন একটা মানসিক বা নৈতিক চাপে প্রাণকে দমনে রাখাই যথেষ্ট হতে পারে কিম্বা তাকে শান্ত ক'রে, এক প্রকারের সুপ্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে ফেলে রাখা যেতে পারে। আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁরা এ বৃত্তিটিকে তার আপন পথে চলতে দিয়ে, সম্ভব হলে আপনা আপনিই নিঃশেষ হয়ে যেতে দেন, বৃত্তির মালিক সে অবকাশে উদাসীন ও অনাশ্লিষ্ট থাকেন বলে বিশ্বাস করেন—কারণ, বলা হয়,

এ ত পুরাতন প্রকৃতিটি একটা অতীত প্রেরণার জের টেনে ছুটে চলেছে মাত্র, শরীরের পতন হলে সেও খসে পড়বে। এ সব সমাধানের কোনটি যখন কার্য্যতঃ সংসিদ্ধ হয় না, সাধক তখন একটা দ্বিধাভিন্ন আভ্যন্তরীণ জীবন যাপন করে চলে—একদিকে তার আধ্যাত্মিক অনুভূতি, অন্যদিকে প্রাণজ দুর্ব্বলতা সব—এই দুয়ের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত সে খণ্ডিত হয়েই থাকে; শ্রেষ্ঠতর অংশটি দিয়ে যতখানি লাভ সম্ভব তার চেষ্টা করে, বাহ্যতর অংশটি যত কম পারে গণনার মধ্যে আনে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে এ সকল পদ্ধতির কোনটিই উপযুক্ত নয়। যদি প্রাণবৃত্তির উপর যথার্থ কর্ত্তৃত্ব ও তাদের যথার্থ রূপান্তর চাও তবে সে কাজ সম্ভব এক এই উপায়ে—যদি তোমার হৃদয়াত্মাকে, তোমার অন্তঃস্থ পুরুষকে পূর্ণভাবে জাগ্রত হতে দাও, ভগবৎ-শক্তির নিরবচ্ছিন্ন স্পর্শের কাছে সর্ব্বাঙ্গ উন্মুক্ত করে ধর, অন্তরাত্মা যাতে মনের, হৃদয়ের ও প্রাণ-প্রকৃতির মধ্যে তার স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ভক্তি, অনন্যচিত্ত আস্পৃহা আর ভাগবত সব-কিছুর দিকে অখণ্ড অব্যভিচারী আবেগ এনে ভরে দিতে পারে তাই করতে দাও। এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উপায় নাই, এর চেয়ে সুগম পথের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া নিরর্থক। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শারীর চেতনা—অবচেতনা—সুপ্তি ও স্বপ্ন—ব্যাধি

আমাদের লক্ষ্য অতিমানস সিদ্ধি—সেই লক্ষ্যের জন্য বা সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে প্রত্যেক স্তরের অবস্থা অনুসারে যা করা প্রয়োজন আমাদের তাই করতে হবে। বর্ত্তমানের প্রয়োজন হল শারীর চেতনাকে প্রস্তুত করা ; এজন্য শারীর স্তরে ও নিম্নতন প্রাণের সব অংশে সম্পূর্ণ সমতা ও শান্তি এবং ব্যক্তিগত দাবি বা বাসনা হতে মুক্ত সম্পূর্ণ সমর্পণ, এই জিনিষ প্রতিষ্ঠা করা চাই। অন্য সব জিনিষ তাদের যথাসময়ে আসতে পারে। এখন যা দরকার তা হল শারীর চেতনায় অন্তঃপুরুষের উন্মেষ, সেখানে নিরন্তর ভাগবত অধিষ্ঠানের ও পরিচালনার বোধ।

*
* *

তুমি যে জিনিষের বর্ণনা দিয়েছ তা হল জড় চেতনা—এর যতটুকু চেতন তাও যন্ত্রবৎ গতানুগতিক, অভ্যাসের দ্বারা কিম্বা নিম্নতন প্রকৃতির শক্তিসমূহের দ্বারা অবশভাবে চালিত। সদাসর্ব্বদা একই অবোধ অজ্ঞান বৃত্তিসকলের পুনরাবৃত্তি করে চলে, আগে হতে যা আছে তার বাঁধা ধারায় ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মে সে আসক্ত, পরিবর্ত্তনে তার অনিচ্ছা, আলোকগ্রহণে অনিচ্ছা, উর্দ্ধতর শক্তির অনুসরণে অনিচ্ছা—ইচ্ছা যদিই থাকে ক্ষমতা নাই—ক্ষমতাও যদি থাকে, তবে আলো বা শক্তি তার মধ্যে যে ক্রিয়া এনে দেয় তাকে নূতন একটা গতানুগতিক ধারায় পরিবর্ত্তিত করে, এবং এভাবে তার প্রাণ ও অন্তরাত্মাটির নিঃশেষ বিলোপ করে দেয়। এ জিনিষ নিষ্প্রভ, নির্ব্বোধ, অলস, তমোগুণের অজ্ঞানে ও জড়তায়, অন্ধকারে ও মন্থরতায় পূর্ণ।

এই জড়চেতনারই মধ্যে আমরা আনতে চেষ্টা করছি প্রথমে উর্দ্ধতর (দিব্য বা অধ্যাত্ম) জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দ, তারপর আমাদের যোগের লক্ষ্য যা সেই অতিমানস সত্য।

*

* *

অতি স্থূল যে শারীর চেতনা তার সম্বন্ধে তুমি সজ্ঞান হয়েছ। ও-জিনিষটি প্রায় সকলেরই মধ্যে ঐ রকমই হয়। তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বা একান্তভাবে নিমগ্ন হয়ে গেলে, মনে হয় এ যেন পশুর চেতনা—হয় নিরালোক ও চঞ্চল, না হয় জড় ও নিরেট, উভয়-ভাবেই ভগবানের দিকে উন্মুক্ত নয়। এর মধ্যে মায়ের শক্তিকে ও উর্দ্ধতর চেতনাকে আনতে পারলে তবে তার মূলতঃ পরিবর্ত্তন সম্ভব। এ সব জিনিষ যখন দেখা দেয়, তখন তাদের আবির্ভাবে বিচলিত হবে না, শুধু মনে রাখবে তারা রয়েছে পরিবর্ত্তিত হওয়ার জন্য।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও প্রথম প্রয়োজন প্রশান্তি—চেতনাকে প্রশান্ত রাখা, তাকে বিক্ষুব্ধ ও উদ্ব্যস্ত হতে না দেওয়া। তারপর সেই প্রশান্তির মধ্যে ভাগবতী শক্তিকে এই তমোরাশি পরিষ্কার করবার জন্য, পরিবর্ত্তন করবার জন্য আহ্বান করা।

*

* *

"বাহ্য শব্দসকলের, বাহ্য শারীর ইন্দ্রিয়ানুভব-সকলের কবলিত", "সাধারণ চেতনাকে যখন ইচ্ছা ঝেড়ে ফেলবার মত আত্ম-কর্ত্তৃত্বের অভাব", "আধারের সমস্ত গতিই হল যোগসাধনা থেকে দূরে সরে যাওয়া"—এ সব কথাই শারীর মনের ও শারীর চেতনার সম্বন্ধে অভ্রান্তভাবে প্রযোজ্য, সেই অবস্থায় যখন এ অঙ্গগুলি আলাদা হয়ে দাঁড়ায়, আর সব অংশ পিছনে ঠেলে দিয়ে এরাই সমস্ত সম্মুখটা জুড়ে বসে। যখন আধারের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা দরকার তখন তার উপর কাজ করবার জন্য

তাকে সম্মুখে এনে ধরা হয়, আর তখন সে এই রকমে সর্ব্বব্যাপক হয়ে ফুটে উঠে, তারই ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করে, তখন মনে হয় একমাত্র সেই অঙ্গটি আছে, আর কোন অঙ্গ নাই; আরও বিপত্তির কথা এই যে যে-জিনিষ পরিবর্ত্তন করতে হবে, অবাঞ্ছনীয় অবস্থা সব, অংশটির বাধা-বিপত্তি সব, তারাই ঠিক প্রথমে আবির্ভূত হয়, তারাই ক্ষেত্রটি দৃঢ়ভাবে অধিকার করে থাকে, তাদেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। শারীর স্তরে জড়তা, তমোভাব, অসামর্থ্য তাদের সমগ্র দৃঢ়তা নিয়ে দেখা দেয়। এই অপ্রীতিকর অবস্থায় একমাত্র করণীয় হল শারীর জড়তার অপেক্ষাও বেশি দৃঢ় হওয়া এবং অটল অধ্যবসায়ের সাথে প্রয়াস করে চলা—স্থির অধ্যবসায় চাই, চঞ্চল দ্বন্দ্ব নয়—যাতে এই নিরেট পাথরের মত বাধার ভিতরেও একটা বিস্তৃত ও স্থায়ী উন্মুক্তি কেটে বের করা যায়।

*
* *

দিনের মধ্যে চেতনার এই রকম বৈষম্য সাধনায় প্রায় সকলেরই ঘটে। এই উত্থান-পতনের, এই শ্লথতার নিয়ম—এই যে উচ্চতর অবস্থা অনুভূত হয়েছে কিন্তু সিদ্ধির মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় নাই কিম্বা সিদ্ধিগত হলেও সর্ব্বতোভাবে স্থায়ী হয় নাই, তা হ'তে একটা দৈনন্দিন বা পূর্ব্বতন নিম্ন অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, এ জিনিষটি সাধনার কাজ যখন শারীর চেতনায় চলে তখনই বিশেষভাবে প্রবল ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শারীর প্রকৃতির একটা জড়ত্ব আছে যার ফলে উচ্চতর প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক যে তীব্রতা তাকে সে সহজে একই ভাবে ধরে রাখতে পারে না—শারীর চেতনা তার অপেক্ষাকৃত সাধারণ অবস্থার মধ্যে সর্ব্বদাই পুনঃপুনঃ নেমে আসে; উচ্চতর চেতনাকে, উচ্চতর চেতনার শক্তিকে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করতে হয়, বারে বারে আসতে হয়, তারপরে তবে তারা শারীর চেতনায় স্থায়ী ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। এই উত্থান-পতন কিম্বা এই

কাল-বিলম্ব যতই দীর্ঘ ও বিরক্তিকর হোক—তোমাকে যেন বিচলিত ও নিরাশ না করে। একটি বিষয়ে সজাগ থেকো যাতে একটা আভ্যন্তরীণ স্থিরতা নিয়ে সর্ব্বদা স্থির থাকতে পার, যতটা সম্ভব উর্দ্ধতর শক্তির কাছে নিজেকে খুলে ধরতে পার, যাতে সত্যকার বিরোধী কোন অবস্থা তোমাকে অধিকার করে না ফেলতে পারে। যদি কোন বিরোধী ধারা না থাকে, তবে আর যা-কিছু রয়েছে সে হল মানুষ মাত্রেরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান যে ধরণের ত্রুটি তারই পুনরাবৃত্তি—এই ত্রুটি ও তার পুনরাবৃত্তি মায়ের শক্তিই কাজ ক'রে ক'রে নির্ম্মূল ক'রে দেবে, তবে সেজন্য সময় প্রয়োজন।

*
* *

নিম্নতন প্রাণময় প্রকৃতির বৃত্তির স্থায়িতা দেখে হতাশ হয়ে পড়বে না। যতদিন জড়তম চেতনা পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হয়ে সমস্ত শারীর প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত না করেছে ততদিন এমন সব বৃত্তি আছে যারা তাদের জের টেনে চলতে চায়, পুনঃপুনঃ ফিরে আসতে চায়। সে পর্য্যন্ত তাদের চাপ বারে বারে দেখা দেয়—কখন তাদের পূর্ব্বতন পূর্ণ শক্তি নিয়ে আসে কখন বা কিছু নিস্তেজভাবে—একটা গতানুগতিক অভ্যাসরূপে আসে। মন ও প্রাণের সকল সম্মতি প্রত্যাহার ক'রে তাদের সমস্ত জীবনীশক্তি হরণ করে নাও—তা হলে গতানুগতিক অভ্যাসটিও আর চিন্তার ও কর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না এবং শেষে বন্ধ হয়ে যাবে।

*
* *

মূলাধার হল শারীর-চেতনার নিজস্ব কেন্দ্র—তার নীচে শরীরের মধ্যে আর যা-কিছু তা একেবারেই জড় এবং সে জিনিষ যত নীচের দিকে নেমে যায় তত বেশি অবচেতন হয়ে চলে; তবে অবচেতনের আসল আসন হল শরীরকে ছাড়িয়ে নীচে, যেমন উর্দ্ধতর চেতনার

(অতিচেতনার) আসল আসন শরীরকে ছাড়িয়ে উপরে। তা হলেও অবচেতনাকে সর্ব্বত্রই অনুভব করা যায়—অনুভব করা যায় যে সে হল চেতনার ধারার নীচে রয়েছে এমন কিছু, যেন চেতনাকে নীচে থেকে ধরে রয়েছে অথবা চেতনাকে নিজের দিকে টেনে নামিয়ে আনছে। অবচেতনা হল যত অভ্যাসগত ক্রিয়া, বিশেষতঃ শারীর ও নিম্নতন প্রাণজ ক্রিয়া, তাদের প্রধান আশ্রয়। প্রাণ হতে বা শারীর স্তর হতে কোন কিছু বহিষ্কার ক'রে দেওয়া হলে, প্রায়ই তা অবচেতনার মধ্যে নেমে যায়, সেখানে বীজরূপে থাকে, যখন পারে আবার উঠে আসে। এই কারণেই অভ্যাসগত প্রাণবৃত্তি হতে মুক্তিলাভ বা স্বভাবের পরিবর্ত্তন এত কঠিন। কারণ, তোমার প্রাণের বৃত্তি এই উৎস হতে অবলম্বন পায়, সতেজ হয়ে ওঠে, এই গর্ভাশয়ে সঞ্জীবিত থাকে, এবং দমিত বা নিরুদ্ধ হলেও আবার ফেটে বের হয়, ফিরে ফিরে দেখা দেয়। অবচেতনার ক্রিয়া অযৌক্তিক, গতানুগতিক, পৌনঃপুনিক। বিচার কি মানস-সঙ্কল্পে সে কর্ণপাত করে না। একমাত্র ঊর্দ্ধতর জ্যোতি ও শক্তিকে তার মধ্যে আনতে পারলে তবে তার পরিবর্ত্তন সম্ভব।

*
* *

প্রকৃতির অন্যান্য প্রধান অঙ্গের মত অবচেতন একদিকে বিশ্বগত আর একদিকে ব্যক্তিগত। তবে অবচেতনেরও বিভিন্ন অংশ বা স্তর আছে। যাকে বলা হয় নিশ্চেতন তার উপর পৃথিবীস্থ যা-কিছু সব প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা আদৌ নিশ্চেতন নয়, তা হল এক সম্পূর্ণভাবে "অব"-চেতনা, একটা অবদমিত বা অন্তর্গূঢ় চেতনা যার মধ্যে সব জিনিষই আছে কিন্তু কিছুই আকৃতি গ্রহণ করে নাই বা প্রকট হয় নাই। এই নিশ্চেতন আর সচেতন মন প্রাণ ও দেহের মাঝখানে রয়েছে অবচেতন। জড়ের নিস্তেজ ও তামস স্তরশ্রেণী হতে জীবনীশক্তির আদিম প্রতিক্রিয়া সব উপরে উঠে

আসতে প্রয়াস করে আর নিরন্তর অভিবৃদ্ধির ফলে একটা ক্রম-বিবর্ত্তিত ও স্বতঃরূপায়িত চেতনায় পরিণত হয়; এই সকল প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাকে অবচেতন ধারণ করে—ধারণ করে বুদ্ধিবৃত্তি, মনোবৃত্তি বা সচেতন প্রতিক্রিয়া রূপে নয়, এ সকলের তরলিত সার-বস্তু রূপে। তা ছাড়া যা-কিছু সচেতনভাবে অনুভূত হয় সে-সমস্তও অবচেতনের মধ্যে ডুবে যায়, সেখানে তাদের স্মৃতি নিমজ্জিত থাকে, তবে সুস্পষ্ট রূপে থাকে না, থাকে অনুভবের অস্পষ্ট অথচ স্তরপনের ছায়া রূপে—এরা সব যে কোন সময়ে উঠে আসতে পারে স্বপ্নের আকারে, অতীত চিন্তা, হৃদয়বৃত্তি, কর্ম্ম প্রভৃতির গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি আকারে, কর্ম্মের মধ্যে ঘটনার মধ্যে বিস্ফুরিত "চিত্তগ্রন্থি" প্রভৃতি নানা আকারে। সব জিনিষ নিজেকে যে পুনরাবর্ত্তিত করে চলে, বাহ্য আকার ভিন্ন বস্তুর অন্য কিছু যে কখন পরিবর্ত্তিত হয় না তার কারণ অবচেতনা। এরই হেতু লোকে বলে স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করা যায় না, আর এরই কারণে যে জিনিষ চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে বলে আশা করা গিয়েছিল তারা ফিরে ফিরে দেখা দেয়। সকল বীজ সেখানে, মনের প্রাণের দেহের সকল সংস্কার সেখানে—মৃত্যুর, ব্যাধির প্রধান অবলম্বন, অজ্ঞানের (আপাত দৃষ্টিতে অভেদ্য) শেষ দুর্গ। আর যে-সমস্ত জিনিষ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হয়ে কেবল নিরুদ্ধ হয়ে আছে তারা ঐখানে তলিয়ে যায়, থাকে বীজরূপে, যে কোন মুহূর্ত্তে প্রস্ফুরিত অঙ্কুরিত হয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

*
* *

আমাদের মধ্যে বিবর্ত্তনধারার প্রতিষ্ঠা হল অবচেতনা—এটি আমাদের অদৃশ্যপ্রকৃতির সবখানি নয় অথবা আমরা যা তার মূল উৎস এ ছাড়া যে আর কিছু নাই তাও নয়। তবে অবচেতন থেকে জিনিষ সব উঠে আসতে পারে, আমাদের সচেতন অংশে রূপ গ্রহণ করতে

পারে; আমাদের ক্ষুদ্রতর প্রাণজ ও শারীর প্রেরণা, ক্রিয়া, অভ্যাস, চরিত্রের গঠনছাঁচ এ সকলের অনেকখানিই এই উৎস হতে আসে।

আমাদের কর্ম্মের তিনটি গুপ্ত উৎস আছে—অতি-চেতন, অন্তস্তল ও অবচেতন: এদের কোনটিরই উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই, কোনটির বোধ পর্য্যন্তও নাই। যে জিনিষটির বোধ আমাদের আছে তা হল বহিঃস্থ সত্তা, স্বরূপতঃ যা হল যন্ত্রহিসাবে ব্যবহারের জন্য একটা ব্যবস্থা মাত্র। সব জিনিষেরই উৎস সাধারণ প্রকৃতি—বিশ্বপ্রকৃতি, যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নিজের একটা ব্যষ্টিরূপ গড়ে চলেছে; এই সাধারণ প্রকৃতিই আমাদের মধ্যে আচরণের কতকগুলি অভ্যাস, একটা ব্যক্তিত্ব, একটা স্বভাব, কতকগুলি গুণ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতা রেখে যায়—আর এই সব নিয়ে যে জিনিষ—তা এখনই গড়ে উঠুক আর জন্মের পূর্ব্বেই গড়ে উঠুক—তাকেই আমরা সাধারণতঃ "আমরা" বলি। এর অনেকখানি আমাদের যে জ্ঞাত, সচেতন বহিঃস্থ সব অংশ তাদের অভ্যাসগত ক্রিয়া ও ব্যবহারে প্রকাশ, কিন্তু আরও অনেকখানি বেশি বহিস্তলের নীচে ও পশ্চাতে যে অজ্ঞাত তিনটি ধারা রয়েছে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

কিন্তু সাধারণ প্রকৃতির তরঙ্গরাজি সাক্ষাৎভাবে হোক বা অসাক্ষাতে অন্যের ভিতর দিয়ে, ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়ে, নানারকম বাহনের ও আশ্রয়ের ভিতর দিয়ে হোক—আমাদের উপর ক্রমাগত এসে পড়ছে এবং তাদের দ্বারা আমাদের বহির্ভাগস্থ সত্তা সতত চালিত, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা পুনরাবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। তার কিছু প্রবাহ আমাদের সচেতন অংশের মধ্যে সোজা চলে যায় এবং সেখানে কাজ করতে থাকে—কিন্তু আমাদের মন তার উৎস জানে না, তাকে অধিকার করে নেয়, মনে করে ও-সবই তার নিজস্ব; এক ভাগ গুপ্তভাবে অবচেতনের মধ্যে আসে অথবা তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় কিন্তু সচেতন বহিস্তলে উঠে আসবার সুযোগ প্রতীক্ষা করে; অনেকখানি চলে যায় অন্তস্তলের মধ্যে—যে কোন সময়ে তা বহির্গত

হতে পারে—আবার নাও পারে, সেখানে অব্যবহৃত উপকরণ হিসাবে পড়ে থাকতে পারে। আর এক অংশ সব ভেদ করে অন্য পারে চলে যায়, প্রত্যাখ্যাত হয়, বিশ্বসাগরের মধ্যে ফিরে নিক্ষেপ করা হয়, বহিষ্কার করা হয়, ঢেলে ফেলা হয়। কতকগুলি শক্তি আমাদের সরবরাহ করা হয়, তাদের নিরন্তর ক্রিয়াই হল আমাদের প্রকৃতি—এই সব শক্তি নিয়ে (বরং তাদের একটা সামান্য অংশ নিয়ে) আমরা যা চাই বা পারি তাই তৈরী করি। যা তৈরী করি মনে হয় তা বুঝি স্থির নির্দ্দিষ্ট, চিরকালের জন্য গঠিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সবই শক্তিধারার লীলা, একটা প্রবাহ, স্থির বা স্থায়ী কিছু নয়। বাহ্যতঃ তাকে যে স্থির মনে হয় তার কারণ একই ধরণের স্পন্দন ও রূপের নিত্য পুনরাবৃত্তি ও পুনরাবির্ভাব হয় বলে। ঠিক এই কারণেই আমাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সম্ভব—বিবেকানন্দের উক্তি ও কবি হোরাসের বচন সত্ত্বেও, অবচেতনের পরিবর্ত্তনবিরোধী বাধা সত্ত্বেও; তবে অবশ্য কাজটি দুরূহ, কারণ প্রকৃতির মুখ্য ধর্ম্মই এই অক্লান্ত পুনরাবৃত্তি ও পুনরাবির্ভাব।

আর আমাদের প্রকৃতির যে সব জিনিষ প্রত্যাখ্যানের ফলে আমরা বাহিরে নিক্ষেপ করি অথচ আবার ফিরে আসে, সে ক্ষেত্রে সবই নির্ভর করে কোথায় নিক্ষেপ করা হয়েছে তার উপর। প্রায়ই দেখা যায় এখানে যেন একটা ক্রমিক ধারা আছে। মন তার মনোবৃত্তি সব প্রত্যাখ্যান করে, প্রাণ প্রত্যাখ্যান করে তার প্রাণবৃত্তি, শরীরও প্রত্যাখ্যান করে তার শারীরবৃত্তি—এরা সকলে সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে তাদের নিজের নিজের রাজ্যে ফিরে যায়। তারা সকলে প্রথমে, প্রত্যাখ্যানের পরেই, থাকে আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে যে একটা আবেষ্টনী-চেতনা নিয়ে চলে বেড়াই এবং যাকে ধরে বাহ্য প্রকৃতির সাথে আমাদের আদান-প্রদান তার মধ্যে; এখান হতেই তারা প্রায়শঃ বারবার ফিরে আসতে থাকে—যতদিনে এতখানি আমূলভাবে প্রত্যাখ্যাত না হয়েছে, বা এতদূরে নিক্ষিপ্ত না হয়েছে যে আর তারা আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারে না। কিন্তু চিন্তায়

ও সম্বন্ধে মন যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে অথচ প্রাণ সবলে সমর্থন করছে, এমন কিছু জিনিষ যদি থাকে, তা হলে মন থেকে তা সরে যায় বটে কিন্তু প্রাণের মধ্যে নেমে আসে, সেখানে গর্জ্জাতে থাকে, চেষ্টা করে সবেগে উঠে আসতে, মনকে পুনরধিকার করতে, আমাদের মনের সম্মতি জোর করে আদায় করতে। উচ্চতর প্রাণ—হৃদয় বা বৃহত্তর প্রাণের ক্রিয়াবেগও যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সেখান থেকে তলিয়ে গিয়ে সে আশ্রয় গ্রহণ করে নিম্নতর প্রাণে—যা হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তি-ধারার সমষ্টি নিয়ে গঠিত আমাদের দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতার আবাস। নিম্নতর প্রাণও যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সে ডুবে যায় শারীর চেতনার মধ্যে আর জড়ত্বের কিম্বা গতানুগতিক পুনরাবৃত্তির জোরে লেগে থাকতে চেষ্টা করে। সেখান থেকেও প্রত্যাখ্যাত হলে, সে অবচেতনার মধ্যে চলে যায় আর স্বপ্ন কি নিষ্ক্রিয়তা কি ঘোর তামসিকতার মধ্যে এসে দেখা দেয়। অবচেতন হল অজ্ঞানের শেষ আশ্রয়।

সাধারণ প্রকৃতি হতে যে সব তরঙ্গ বারে বারে ফিরে আসে তাদের সম্বন্ধে কথা এই—সাধারণ প্রকৃতির যত নিম্নতন শক্তি তাদের স্বাভাবিক ধারাই হল ব্যক্তির মধ্যে তাদের ক্রিয়াকে স্থায়ী করে তোলবার চেষ্টা, তাদের রচনাকে যতখানি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে ততখানি আবার পুনর্গঠিত করা—তাই তারা যখন দেখে তাদের প্রভাব প্রত্যাখ্যাত তখন বার বার তার উপর ফিরে আসে—অনেক সময়েই আসে দ্বিগুণ জোরে, এমন কি দারুণ প্রচণ্ডবেগে। কিন্তু একবার যদি আবেষ্টনী-চেতনা পরিষ্কার করে ফেলা হয় তবে তারা বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না—যদি না আসুর শক্তিরা এসে যোগদান করে। তা হলেও, এদের আক্রমণ সত্ত্বেও সাধক যদি তার আন্তর আত্মসত্তায় স্থিতি লাভ করে থাকে তা হলে তারা আক্রমণ করে বটে কিন্তু পরাহত হয়ে ফিরে যায়।

এ কথা সত্য, আমরা যে জিনিষ তার অনেকখানি—আরও ঠিক বলতে গেলে, আমাদের পূর্ব্বসংস্কার, বিশ্বপ্রকৃতির উপর আমাদের

প্রতিক্রিয়ার ধারা, এ সকলের অনেকখানি,—আমরা আমাদের পূর্ব্বজন্ম হতে নিয়ে আসি। বংশানুক্রমের প্রভাব প্রবল কেবল আধারের বাহ্য অংশটির উপর—আবার সেখানেও বংশানুক্রমের সব ফলই যে গৃহীত হয় তা নয়, কেবল সেইগুলিই গৃহীত হয় যারা আমাদের যা হয়ে উঠতে হবে তার অনুকূল, অন্ততঃপক্ষে তার প্রতিবন্ধক নয়।

*
* *

অবচেতন হল যত অভ্যাসের আর স্মৃতির ব্যাপার—তার কাজ পুরাতন নিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিঘাত সকলের, মানস প্রাণজ শারীর সাড়া সকলের, অক্লান্তভাবে বা যখনই পারা যায় তখনই পুনরাবৃত্তি। যাতে সে তার অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া সব বিসর্জ্জন দিয়ে নূতন ও সত্য প্রতিক্রিয়া অর্জ্জন করতে পারে সে জন্য সত্তার ঊর্দ্ধতর অংশের আরও অধিকতর অক্লান্ত প্রভাব প্রয়োগে তাকে শিক্ষিত দীক্ষিত করে তুলতে হবে।

*
* *

সাধারণ প্রাকৃত সত্তা কতখানি যে অবচেতন দেহস্তরের মধ্যে তার জীবন যাপন করে তা তোমার ধারণায় আসে না। মনের ও প্রাণের অভ্যাসগত ক্রিয়া সব ওখানেই সঞ্চিত থাকে, জাগ্রত মনের মধ্যে তারা ওখান থেকেই উঠে আসে। উপরকার চেতনা হতে বিতাড়িত হয়ে তারা সব এই পণিদের গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। জাগ্রত অবস্থায় তারা যখন আর উঠে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে না তখন তারা নিদ্রায় স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। অবচেতন হ'তে তারা যখন নিষ্কাশিত, ঐ সব অন্তরালস্থ স্তরে আলোকসম্পাতের ফলে তাদের বীজ পর্য্যন্ত যখন বিনষ্ট তখনই চিরকালের জন্য তারা লুপ্ত হয়। তোমার চেতনা যত গভীরতরভাবে অন্তর্ম্মুখী হবে, ঐ সব

নিম্নতন আবরিত অংশে ঊর্দ্ধের আলো যত নেমে আসবে, যে সব জিনিষের এখন এইভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটছে তারা তত দূর হতে থাকবে।

*
* *

নীচে হতে বল আকর্ষণ করা নিশ্চয়ই সম্ভব। তোমার আকর্ষণের ফলে নিভৃত দিব্যশক্তি সব নীচে হতে উঠে আসতে পারে—তা যদি হয় তবে এই ঊর্দ্ধমুখী গতি উপর হতে আগত দিব্যশক্তির গতি ও প্রয়াসকে সম্পূর্ণ করে, বিশেষভাবে তাকে শরীরের মধ্যে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। কিন্তু আবার বিপরীত ভাবে তোমার আহ্বানে নীচে থেকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন শক্তিরাও সাড়া দিতে পারে—এ ধরণের আকর্ষণ হয় তামসিকতা না হয় অশান্তি এনে দেয়—অনেক সময়ে স্তূপীকৃত জড়তা আর ভীষণ বিক্ষোভ ও বিপর্য্যয় পর্য্যন্ত এনে দেয়।

নিম্নতন প্রাণ একটা গাঢ়-অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তর—একে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধরা কেবল তখনই লাভের হয় যখন এর উপকার অন্যান্য স্তররাজি আলোর ও জ্ঞানের দিকে উদার প্রসারিত করে ধরা হয়েছে। এই ঊর্দ্ধতর আয়োজন ব্যতীত ও জ্ঞান ব্যতীত যে নিম্নতর প্রাণে মনঃসংযোগ করে তার অনেক বিপত্তির মধ্যে পড়বার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ কথার অর্থ এমন নয় যে, এ স্তরের অনুভূতি এর আগে বা একেবারে প্রথমেই আসবে না—তারা আপনা হতেই এসে উপস্থিত হয়, তবে তাদের জন্য অত্যধিক বিস্তৃত স্থান করে দেওয়া উচিত নয়।

*
* *

আভ্যন্তরীণ শরীরের মধ্যে এক যোগশক্তি কুণ্ডলিত বা সুপ্ত ছে—তবে সে সক্রিয় নয়। যখন যোগ অভ্যাস করা হয় তখন

এই শক্তিটি তার কুণ্ডলী খুলতে থাকে আর আমাদের উপরে প্রতীক্ষা করে রয়েছে যে ভাগবত চেতনা ও শক্তি তার সাথে মিলবার জন্য ঊর্দ্ধে উঠে চলে। এ যখন ঘটে, যখন জাগরিত যোগশক্তি উঠে চলে, তখন অনেক সময় অনুভব হয় যেন একটি সাপ তার কুণ্ডলী খুলছে, সোজা দাঁড়িয়ে উঠছে, ক্রমেই উপরের দিকে নিজেকে তুলে ধরছে। যোগশক্তি যখন ঊর্দ্ধস্থ ভাগবত চেতনার সাথে মিলিত হয়, তখন ভাগবত চেতনার শক্তি আরও সহজে শরীরের মধ্যে অবতরণ করতে পারে, এবং সেখানে সে যে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের জন্য কাজ করছে তাও অনুভব করা যায়।

তোমার দেহ, তোমার চক্ষু উপরের দিকে আকর্ষিত হতেছে এই অনুভবও ঐ একই প্রক্রিয়ার অঙ্গ। এ হল শরীরের যে আন্তর চেতনা, শরীরের যে আন্তর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি তারাই ঊর্দ্ধমুখে দেখছে ও চলছে আর ঊর্দ্ধস্থ ভাগবত চেতনা ও ভাগবত দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হতে চেষ্টা করছে।

*

* *

তুমি যদি তোমার প্রকৃতির নিম্নতন অংশে বা স্তরে নেমে যাও, তা হলে তোমাকে সর্ব্বদা সতর্ক হতে হবে যাতে চেতনার যে সব ঊর্দ্ধতর স্তর ইতিমধ্যেই নবজীবন লাভ করেছে তার সাথে সজাগ সংযোগ বজায় থাকে, আর যাতে তাদের ভিতর দিয়ে এই সব অধস্তন, এখন-অবধি অসংস্কৃত রাজ্যের মধ্যে দিব্য জ্যোতি ও শুচিতা নামিয়ে আনতে পার। এই সজাগ সতর্কতা যদি না থাকে তা হলে ইতর স্তররাজির অশুদ্ধ ক্রিয়াধারার মধ্যে ডুবে যেতে হয়,—ফল, অন্ধকারগ্রস্ততা ও বিপত্তি।

সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হল চেতনার ঊর্দ্ধতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সেখান হতে নিম্নতন চেতনার উপর পরিবর্ত্তনের জন্য চাপ দেওয়া। কাজটি এভাবেও করা যেতে পারে, তবে তার কৌশল ও

অভ্যাস তোমার আয়ত্ত করা দরকার। এ শক্তি যদি তুমি অর্জ্জন করতে পার তবে তাতে তোমার উন্নতির পথ অনেক সহজ, সুগম ও কম কষ্টকর হবে।

*
* *

"চিত্ত-বিশ্লেষণ" প্রক্রিয়া অভ্যাস করা তোমার ভুল হয়েছিল। এতে শুদ্ধির কাজটি—কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ—সহজ নয়, বেশি জটিল করে তুলেছে। ফ্রয়েডের "চিত্ত-বিশ্লেষণ" বিদ্যাকে যোগ-সাধনা হতে যত দূরে সম্ভব রাখা কর্ত্তব্য। ও-বিদ্যা মানবপ্রকৃতির একটি অংশকে গ্রহণ করে—যেটি হল সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকারাচ্ছন্ন, সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্‌সঙ্কুল, সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর—নিম্নতন প্রাণের অবচেতন স্তর—তারও আবার যে সব সর্ব্বাপেক্ষা বিকারগ্রস্ত প্রকাশ সে সকলকে সমগ্র হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, প্রকৃতির মধ্যে এই অংশটির যে সত্যকার কাজ তার তুলনায় অসম্ভবরকম অতিকায় কর্ম্মভার এর এবং এর বিকৃতি-গুলির উপর আরোপ করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে শিশু, যুগপৎ দুঃসাহসী অনিশ্চিত অপরিপক্ক। সকল শিশুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব-মনের এই যে সর্ব্বসাধারণ অভ্যাস—একটা আংশিক বা স্থানীয় সত্যকে গ্রহণ করা, তাকে অসঙ্গতভাবে সার্ব্বিক সত্য করে তোলা, তার সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় প্রকৃতির একটা সমগ্র ক্ষেত্রই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা—তা এখানে একেবারে উদ্দাম হয়ে চলেছে। আরও কথা, নিরুদ্ধ কামবৃত্তির কার্য্যকলাপকে যে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা একটা বিপজ্জনক মিথ্যা, তার ফল অতি কদর্য্য হতে পারে, তাতে মন প্রাণ আগের চেয়ে মূলতঃ বেশি নয়, কম শুদ্ধির দিকে চলতে পারে।

এ কথা সত্য মানুষের অন্তস্তল তার প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ, তার বহিস্তলের ক্রিয়াবলীকে ব্যাখ্যা করে যত অদৃশ্য শক্তি-উৎস তাদের গোপন রহস্য এখানেই। কিন্তু ফ্রয়েডের চিত্তবিশ্লেষণ-বিদ্যা

মনে হয় জানে কেবলমাত্র নিম্নতন প্রাণের অবচেতন—এরও জানে আবার শুধু কয়েকটি ম্লান কোণ-কানাচ—এটি সমগ্র অন্তস্তলের এক খণ্ডিত ও অত্যন্ত ইতর অংশ মাত্র। অন্তস্তলস্থ সত্তা সমগ্র বাহ্য মানুষটির পিছনে থেকে তাকে ধারণ করছে,—তার বহিস্তলের মনের পিছনে রয়েছে একটা বৃহত্তর ও দক্ষতর মন, বহিস্তলের প্রাণের পিছনে রয়েছে একটা বৃহত্তর ও বলবত্তর প্রাণ, বহিস্তলের দেহ-চেতনার পিছনে রয়েছে একটা সূক্ষ্মতর ও মুক্ততর শারীর চেতনা। এই অন্তরঙ্গটি বহিরঙ্গগুলির উপরে ঊর্দ্ধতর অতিচেতনের দিকে, আর তাদের নীচে নিম্নতন অবচেতন স্তররাজির দিকে নিজেকে খুলে রেখেছে। প্রকৃতিকে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করতে হলে, এই ঊর্দ্ধতর স্তররাজির শক্তির কাছে নিজেকে খুলে ধরতে হবে, অন্তস্তল ও বহিস্তল উভয়তঃই সত্তাকে তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ কাজটিও সাবধানে করতে হবে, অসময়ে নয়, আকস্মিক উত্তেজনার বশে নয়—পরন্তু ঊর্দ্ধতর একটা নির্দ্দেশ অনুসরণ করে, সর্ব্বদা ঠিক মূলভাবটি ধরে রেখে; অন্যথা যে শক্তিকে আকর্ষণ করে আনা হয় তা অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও দুর্ব্বল আধারের পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত হতে পারে। কিন্তু আরম্ভেই নিম্নতন অবচেতনকে খুলে ধরা, তার মধ্যে যত কিছু ক্লেদময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন তাদের জেগে উঠবার সুযোগ করে দেওয়া —এ হল সাধ করে বিপদ ডেকে আনা। প্রথমে দরকার মনের ও প্রাণের ঊর্দ্ধতর স্তরকে সমর্থ, দৃঢ়, উপরকার জ্যোতি ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলা; তারপরে অবচেতনকে খুলে ধরা যেতে পারে, এমন কি তার মধ্যে ডুব দেওয়াও যেতে পারে—তখন ও-কাজটি অনেক নিরাপদ হয় এবং পরিবর্ত্তনকে দ্রুত ও সফল করবার সম্ভাবনাও তখনই আসে।

অনুভবের ভিতর দিয়ে জিনিষকে দূর করার পদ্ধতিও বিপজ্জনক হতে পারে—কারণ এ পথে মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে সহজেই আরও জড়িত হয়ে পড়া যায়। এ পদ্ধতির পিছনে দুটি সুপরিচিত

মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য রয়েছে। এক হল, স্বেচ্ছাকৃত ভোগের দ্বারা ক্ষয়,—এটি কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র প্রযোজ্য, বিশেষতঃ যখন কোন স্বভাবগত প্রবৃত্তির এতখানি অধিকার বা প্রকোপ থাকে যে বিচারের দ্বারা, কিম্বা প্রত্যাখ্যান ও পরিবর্ত্তে সত্য বৃত্তির স্থাপন করবার যে পদ্ধতি তার দ্বারা, তাকে দূর করা যায় না; এ রকম অবস্থা অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে উঠলে সাধককে অনেক সময়ে সাধারণ জীবনে সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে ফিরে পর্য্যন্ত যেতে হয়, একটা নূতন মন ও সঙ্কল্প আশ্রয় করে সে-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, তারপর এ রকমে বাধাটি যখন দূর হয়েছে বা হওয়ার মত হয়েছে তখন আবার অধ্যাত্মজীবন গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত ভোগের এই পদ্ধতি সর্ব্বদাই বিপজ্জনক, যদিও কখন কখন তা অপরিহার্য্য। সত্তার মধ্যে অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্য যদি বিশেষ দৃঢ়সঙ্কল্প থাকে তবেই এ পদ্ধতি সফল হয়; কারণ ভোগ তা হলে একটা প্রবল অতৃপ্তি ও প্রতিক্রিয়া—বৈরাগ্য—নিয়ে আসে, আর তখন অধ্যাত্মসিদ্ধিমুখী সঙ্কল্পকে প্রকৃতির অবাধ্য অংশের মধ্যেও নামিয়ে আনা যায়।

অনুভবের অন্য উদ্দেশ্যটি আরও সাধারণভাবে প্রযোজ্য; আধার হতে কোন কিছু বহিষ্কার করতে হলে তার সম্বন্ধে প্রথমে সজ্ঞান হওয়া দরকার, তার ক্রিয়া সুস্পষ্ট উপলব্ধি অন্তরে লাভ করা দরকার, আর দরকার স্বভাবের কর্ম্মধারার মধ্যে তার সঠিক স্থানটি আবিষ্কার করা। পরে তা হলে, বৃত্তিটি যদি সম্পূর্ণ বিপথের হয়, তবে তার নিষ্কাষণের জন্য তার উপর কাজ করা চলে; অথবা তা যদি একটা উচ্চতর ও সত্য ধারার অপভ্রংশ হয় তবে রূপান্তরের জন্য তার উপর কাজ করা চলতে পারে। এই জিনিষটি বা এই ধরণের কিছু চিত্তবিশ্লেষবিদ্যায় চেষ্টা করা হয়, যদিও স্থূলভাবে, অপরিপক্ক ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে অসঙ্গতভাবে। নিম্নতন বৃত্তিকে জানতে হলে, তাদের সাথে বোঝাপড়া করতে হলে চেতনার পূর্ণ

আলোকের মধ্যে তাদের তুলে ধরা, এই হল অপরিহার্য্য প্রক্রিয়া; এ রকমে ছাড়া সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারে—কেবল তখনই যখন একটা ঊর্দ্ধতর জ্যোতি ও শক্তির ক্রিয়া এতখানি প্রবল হয়েছে যে তারা তাদের কাছে পরিবর্ত্তনের জন্য উপস্থাপিত বৃত্তিটির বেগ, বিলম্বে হোক অবিলম্বে হোক, পরাভূত করতে পারে। "অনুভবের" নাম করে অনেকে প্রতিকূল বৃত্তিটি যে কেবল জাগিয়ে তোলে তা নয়, পরন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান না ক'রে সম্মতি দিয়ে সমর্থন করে, তাকে বন্ধ না করবার, বার বার ফিরিয়ে আনবার পক্ষে সব যুক্তি আবিষ্কার করে, এ ভাবে তাকে নিয়ে খেলা করা চলে, তার পুনরাবর্ত্তনে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে চিরস্থায়ী ক'রে তোলে। পরে যখন তার বহিষ্কারের উদ্যোগ করা হয় তখন দেখা যায় তার অধিকার এত দৃঢ় হয়ে গিয়েছে যে তার কবলে সাধক নিজেকে অসহায় বোধ করে,—তখন একটা নিদারুণ দ্বন্দ্ব অথবা ভগবৎ করুণার আকস্মিক আবির্ভাব ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভব হয় না। এ কর্ম্মটি অনেকে করে প্রাণের একটা কুটিলতা বা বিকৃতির ফলে—অনেকে করে শুধু অজ্ঞানের বশে। কিন্তু জীবনে যে রকম, যোগেও তেমনি, অজ্ঞানকে প্রকৃতি দোষস্খালনে ন্যায্য হেতু বলে স্বীকার করে না। স্বভাবের অজ্ঞান অংশ-সকলের সাথে যেখানেই অসঙ্গত ব্যবস্থা হয়েছে সেখানেই এই বিপদ; কিন্তু নিম্নতন, প্রাণগত, অবচেতনা আর তার বৃত্তিরাজির অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞান, অধিকতর বিপৎসঙ্কুল, অধিকতর যুক্তিহীন ও দুরপনেয় জিনিষ আর কিছু নাই। একে "অনুভবের" জন্য অকালে বা অসঙ্গতভাবে জাগিয়ে তোলার বিপদ হল এর মলিন কদর্য্য প্রলেপে সচেতন অংশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করা, সমস্ত প্রাণময় এমন কি মনোময় প্রকৃতি পর্য্যন্ত বিষাক্ত করে তোলা। সুতরাং সর্ব্বদাই নেতিমুখী নয়, ইতিমুখী অনুভূতি দিয়ে আরম্ভ করা উচিত, সচেতন সত্তার যে সকল অংশ পরিবর্ত্তন করতে হবে তাদের মধ্যে আগে

৮

নামিয়ে আনা প্রয়োজন দিব্যপ্রকৃতির কিছু স্থিরতা, জ্যোতি, সমতা, শুদ্ধি, দিব্য-শক্তি। এ কাজটিতে যখন যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া গিয়েছে একটা দৃঢ় ইতিমুখী প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখনই দিব্য স্থিরতা, জ্যোতি শক্তি ও জ্ঞানের বলে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত করবার জন্তেই অবচেতনের লুকান প্রতিকূল উপাদান সব জাগিয়ে তোলা নিরাপদ। এমন কি সে অবস্থাতেও, নিম্নতন স্তর হতে যথেষ্ট পরিমাণে উপকরণ সব আপনা হতেই উঠে আসবে এবং বাধা দূর করবার জন্য যতখানি বাধা "অনুভব" তোমার দরকার তা সব তোমায় জোগাড় করে দেবে। তবে তখন অনেকখানি নিরাপদে এবং একটা উচ্চতর নির্দ্দেশের সহায়ে সে সব বস্তুর সম্মুখীন তুমি হতে পারবে।

*
* *

এ সকল চিত্তবিশ্লেষকরা যখন তাদের মাটির দীপের স্তিমিত শিখা ধরে ধরে অধ্যাত্ম অনুভূতির সূক্ষ্ম পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে তখন তাদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনাই আমার পক্ষে কষ্টকর—অথচ এরকম অগ্রাহ্য করাও আবার ঠিক নয়, কারণ অর্দ্ধজ্ঞানের পরাক্রম আছে এবং সত্য সত্যটি সম্মুখে এসে প্রকট হওয়ার পক্ষে তা বিশেষ অন্তরায় হতে পারে। এই নূতন মনোবিজ্ঞান আমার কাছে মনে হয় বর্ণমালা অভ্যাস করছে অনেকটা এমন শিশুদের মত, তবে সে বর্ণমালা সংক্ষিপ্ত এবং যথেষ্ট সম্পূর্ণ নয়,—তাদের অবচেতন এবং অন্তস্তলগত রহস্যময় অতি-অহং নিয়ে যে অ-আ-ক-খ, সে-সব অক্ষর যোগ করে করে উল্লাস করছে, আর মনে করছে তাদের অস্পষ্ট আরম্ভের প্রথম-পাঠ হল পূর্ণজ্ঞানের একেবারে মর্ম্মকোষ। তারা নীচে থেকে দেখে উপরের দিকে, ঊর্দ্ধতর জ্যোতিরাজিকে ব্যাখ্যা করে নিম্নতন অন্ধকার দিয়ে; কিন্তু এ সকল জিনিষের মূল উপরেই, নীচে নয়—উপরি বুধ্ন এষাম্। অবচেতন নয়, অতি-চেতনই হল জিনিষের সত্য প্রতিষ্ঠা। পদ্মের তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না যে পাঁক

থেকে সে উঠেছে তার গূঢ় রহস্য বিশ্লেষণ ক'রে; পদ্মের রহস্য পদ্মের যে স্বর্গীয় প্রতিরূপ ঊর্দ্ধস্থ জ্যোতির্ম্মণ্ডলে নিত্যপ্রস্ফুটিত তার মধ্যে। তা ছাড়া, এই সব মনস্তাত্ত্বিকেরা যে ক্ষেত্রটি নিজেরা বিশেষ করে বেছে নিয়েছেন তা দীন, অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ। অংশকে জানতে হলে আগে সমগ্রকে জানা দরকার, নিম্নতমকে সত্য-সত্য বুঝতে হলে উচ্চতমকে আগে বোঝা দরকার। এ হবে এক মহত্তর মনোবিজ্ঞানের দান—সে বিদ্যা তার যথাসময়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে—তার আবির্ভাবে বর্ত্তমানের অসমর্থ অনিশ্চিত অন্ধ-চেষ্টা সব ঘুচে যাবে, নিরর্থক হয়ে পড়বে।

*
* *

নিদ্রার প্রতিষ্ঠা অবচেতন বলে—অবশ্য তা যদি সচেতন নিদ্রা না হয়—সাধারণতঃ চেতনাকে নীচে নামিয়ে ধরে। একমাত্র প্রতিকার হল নিদ্রাকে ক্রমে অধিকতর সচেতন করে তোলা; তবে যে পর্য্যন্ত তা না হয় সে পর্য্যন্ত জেগে উঠলেই এই নিম্নমুখী গতির বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করবে, রাত্রির পর রাত্রির তমোভাবকে পুঞ্জিভূত হতে দিবে না। কিন্তু এ সকল জিনিষের জন্য দরকার নিয়মিত প্রয়াস এবং শিক্ষাভ্যাস, আর দরকার সময়। আশু ফল দেখা দেয় না বলে চেষ্টা থেকে বিরত হলে চলবে না।

*
* *

নিদ্রার সময়ে যদি ঊর্দ্ধমুখী কোনরকম অনুভূতি না হয় অথবা যোগলব্ধ চেতনা যদি একেবারে শারীর স্তরেই এতখানি দৃঢ় না হয়ে থাকে যাতে অবচেতনগত জড়ত্বের আকর্ষণ সে ব্যাহত করতে পারে তবে জাগ্রত চেতনায় সাধনার দ্বারা যে উপলব্ধির স্তর লাভ হয়েছে তা থেকে রাত্রির চেতনা প্রায় সর্ব্বদাই নীচে নেমে পড়ে। সাধারণত নিদ্রায় শরীরগত চেতনা হল অবচেতন স্থূলভৌতিক চেতনা, আর এ চেতনা

স্তিমিত চেতনা, সত্তার অবশিষ্ট অংশের মত সজাগ ও সজীব নয়। এ সময়ে সত্তার অবশিষ্ট অংশটি পিছনে সরে দাঁড়ায়, চেতনার খানিকটা অন্যান্য স্তরে ও লোকে চলে যায় আর সে-সকল স্থানে যে নানা অনুভূতি লাভ করে তারাই স্বপ্নে লিপিবদ্ধ হয়—তুমি যার বর্ণনা দিয়েছ তা এই ধরণের জিনিষ। তুমি বলছ তুমি অত্যন্ত খারাপ সব স্থানে যাও, আর যে বিবরণ দিয়েছ সেই ধরণের অনুভূতি হয়—কিন্তু তোমার মধ্যে খারাপ কিছু আছেই আছে তার লক্ষণ এ নয়। এর অর্থ শুধু এই যে তুমি প্রাণময় লোকে চলে যাও,—সকলেই তাই যায়—আর প্রাণময় লোক এই ধরণের স্থানে ও অনুভূতির বিষয়ে পরিপূর্ণ। তোমার কর্ত্তব্য হল ওদিকে আদৌ যাওয়া বন্ধ করা ততখানি নয়—কারণ তা একেবারে বন্ধ করা যায় না—যতখানি মায়ের পূর্ণ অভয় নিয়ে যাওয়া, যে পর্য্যন্ত অতিভৌতিক প্রকৃতির এই সব রাজ্যে তুমি কর্ত্তৃত্ব লাভ না কর। তাই অন্ততঃ নিদ্রার পূর্ব্বে মাকে স্মরণ করবে ও তাঁর শক্তির কাছে নিজেকে খুলে রাখবে। কারণ এ অভ্যাসটি তোমার যত বেশি হবে, যত এ কাজটি সাফল্যের সাথে করতে পারবে, মায়ের অভয় ততই তোমার সাথে থাকবে।

*
* *

এ সকল স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন নয়—সবগুলি যদৃচ্ছাভাবে, অসংলগ্নভাবে বা অবচেতন দিয়ে যে গঠিত তা নয়। অনেকগুলি হল সুষুপ্তির মধ্যে যে প্রাণস্তরে প্রবেশ করা হয় সেখানকার অভিজ্ঞতার আলেখ্য, প্রতিলিপি, আর কতক সূক্ষ্ম-দেহস্তরের দৃশ্যাবলী ও ঘটনাবলী। সেখানে প্রায়ই এমন সব ব্যাপারের সাথে জড়িত হতে হয়, এমন সব কর্ম্ম করা হয় যা ঠিক স্থূলজীবনের ব্যাপারও কর্ম্মেরই মত; উভয়ত্র একই পারিপার্শ্বিক, একই লোকজন—তবে সাধারণতঃ বিন্যাসের ধরণে ও আকারের গড়নে থাকে কিছু বা অনেকখানি পার্থক্য। এ ছাড়া স্থূলজীবনে পরিচিত নয়, স্থূলজগতের অন্তর্ভুক্ত আদৌ নয়

এমন অন্যতর আবেষ্টনী ও অন্যতর লোকের সাথে সংস্পর্শও সেখানে ঘটতে পারে।

জাগ্রত অবস্থায় তুমি তোমার স্বভাবের শুধু একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ও কর্ম্মধারা সম্বন্ধে সচেতন। নিদ্রায় এই ক্ষেত্রটির ওপারে যে সব জিনিষ তাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বোধ তোমার হতে পারে,—যেমন জাগ্রত অবস্থার পশ্চাতে বৃহত্তর এক মনোময় বা প্রাণময় প্রকৃতি, কিম্বা একটা সূক্ষ্মদেহিক বা একটা অবচেতন প্রকৃতি যেখানে এমন অনেক কিছু রয়ে গেছে যা তোমার জাগ্রত অবস্থায় সুস্পষ্ট সক্রিয় নয়। এই যাবতীয় তমসাচ্ছন্ন ভূমিকেই পরিষ্কার করতে হবে—নতুবা প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হতে পারে না। প্রাণস্তরজাত বা অবচেতনজাত স্বপ্নের ভারে চঞ্চল হয়ে পড়বে না—এই দুটি নিয়েই অধিকাংশ স্বপ্নগত অনুভূতি ; কেবল আস্পৃহা রাখবে যাতে এ সকল জিনিষ হতে এবং যে-সমস্ত বৃত্তির তারা নিদর্শন তাদের হতে মুক্ত হতে পার, যাতে সচেতন হতে পার, এক ভাগবত সত্যটি ছাড়া আর সব কিছু প্রত্যাখ্যান করতে পার। এই সত্যটি তুমি যতই আপনার করতে পারবে, জাগ্রত অবস্থায় আর সব প্রত্যাখ্যান ক'রে তাকেই ধ'রে থাকতে পারবে, ততই এই নিম্নতর স্বপ্ন-উপাদান নির্ম্মল হতে থাকবে।

*
* *

যে সকল স্বপ্নের বর্ণনা তুমি দিয়েছ তারা স্পষ্টই প্রাণময় স্তরের প্রতীক স্বপ্ন। এ রকম স্বপ্ন সব কিছুরই প্রতীক হতে পারে—শক্তিরাজির লীলা, কৃতকর্ম্মের বা অনুভূতির ভিতরকার গড়ন ও উপাদান, বাস্তব বা সম্ভাব্য ঘটনাবলী, আন্তর বা বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে সত্যকার বা কল্পিত গতি-ধারা কিম্বা কোন পরিবর্ত্তন।

স্বপ্নে তুমি যে আশঙ্কার কথা দেখেছিলে তা তোমার মধ্যে একটা ভীরুতার চিহ্ন, তবে সে ভীরুতা সম্ভবত সচেতন মনের বা উচ্চতর প্রাণের কিছু নয়, তা হল নিম্নতন প্রাণপ্রকৃতির মধ্যে অবচেতন কিছু। এ অংশটি সর্ব্বদাই নিজেকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বোধ করে আর সহজেই

তার ভয় হয় পাছে মহত্তর চেতনাটি তাকে গ্রাস করে ফেলে—এ ভয়টি কারো কারো পক্ষে প্রথম সংস্পর্শে একটা পলায়নবেগ বা সন্ত্রাসের আকার পর্য্যন্ত ধারণ করতে পারে।

*
* *

এ ধরণের স্বপ্নগুলি স্পষ্টই এমন সব সৃষ্টি যাদের সাথে প্রাণস্তরে প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়—মনের স্তরেও হয়, তবে কচিৎ কদাচিৎ। কখন কখন তারা তোমার নিজেরই মনের বা প্রাণের সৃষ্টি; কখন কখন তা অন্য মনের সৃষ্টি, তবে তোমার মনে, হয় যথাযথ নয় পরিবর্ত্তিতভাবে, প্রতিফলিত; কখন আবার অন্যান্য স্তরের অ-মানুষী শক্তি বা সত্তার সৃষ্টি-সবও এসে থাকে। স্থূলজগতে এসব জিনিষ সত্য নয়, সত্য হয়ে নাও উঠতে পারে; তবু স্থূলে তাদের ফল দেখা দিতে পারে, যদি ঐ উদ্দেশ্যে বা ঐ প্রেরণা নিয়ে তারা গঠিত হয়ে থাকে; আর যদি তাদের আপন ধারায় চলতে দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রেও ভিতরের বা বাহিরের জীবনে তারা তাদের ঘটনাবলী বা অর্থকে বাস্তব ক'রে তুলতে পারে—কারণ তারা প্রায় সর্ব্বত্রই ভিতরের বা বাহিরের জীবনের কোন কিছুর প্রতীক বা নক্সা। তাদের সাথে সঙ্গত সম্বন্ধ হল তাদের লক্ষ্য করে যাওয়া ও বুঝা, আর যদি তারা শত্রুপক্ষ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে তবে তাদের প্রত্যাখ্যান করা ও ধ্বংস করা।

আর এক রকমের স্বপ্ন আছে যাদের প্রকৃতি ভিন্ন—তারা হল অন্য স্তরে, অন্য জগতে, আমাদের এখানকার হতে ভিন্ন অবস্থার মধ্যে সত্যসত্যই ঘটে যেসব জিনিষ তাদের প্রতিরূপ বা প্রতিলিপি। আবার এক প্রকারের স্বপ্ন আছে যারা পূর্ণমাত্রায় প্রতীক, আরও কতকগুলি আছে যারা জাগ্রত মনের পরিচিতই হোক আর অজ্ঞাতই হোক আমাদের ভিতরে বর্ত্তমান বৃত্তির ও প্রবৃত্তির পরিচায়ক; আবার কতকের উপজীব্য পুরাতন সব স্মৃতি; কতক অবচেতনের মধ্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে সঞ্চিত বা সেখানেও সক্রিয় যে সব বস্তু তাদের তুলে ধরে—এ সবে মিলে নানা

উপকরণের একটা পিণ্ড গড়েছে—উচ্চতর চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথে এটিকে পরিবর্ত্তন, তা না হয় পরিবর্জ্জন করতে হবে। অর্থ আবিষ্কার করতে যদি শিক্ষা করা যায় তবে স্বপ্ন থেকে আমাদের প্রকৃতি ও অন্য প্রকৃতিরও অনেক জ্ঞান লাভ হতে পারে।

*

* *

রাত্রে জেগে থাকার চেষ্টা ঠিক পথ নয়। প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিদ্রার অভাবে শরীর তামসিক হয়ে পড়ে, জাগ্রত সময়ে যে একাগ্রতা দরকার তাতে অক্ষমতা আসে। ঠিক পথ হল নিদ্রাকে রূপান্তরিত করা, বিলুপ্ত করা নয়—বিশেষভাবে নিদ্রারই মধ্যে কি রকমে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠা যায় তা শিক্ষা করা। এ কাজটি যদি হয়, তবে নিদ্রা চেতনার একটা আভ্যন্তরীণ প্রকরণে পরিণত হয়, তার মধ্যে জাগ্রত অবস্থারই মত সমানে সাধনা চলতে পারে; সেই সাথেই আবার সাধক স্থূল-স্তরের অতীত অন্যান্য চেতনার স্তরে প্রবেশ করতে পারে, আর সমাচার হিসাবে ও ব্যবহারযোগ্যতা হিসাবে উভয় রকমেরই প্রভূত পরিমাণ অভিজ্ঞতা আহরণ করতে পারে।

*

* *

নিদ্রার পরিবর্তে আর-কিছুর স্থান করে দেওয়া নয়, তবে নিদ্রাকে পরিবর্ত্তন করা যায়—কারণ নিদ্রার মধ্যেই তুমি সচেতন থাকতে পার। এ ভাবে সচেতন হলে, রাত্রিটি এক ঊর্দ্ধতর ক্রিয়ায় ব্যবহার করা যেতে পারে—অবশ্য শরীর যদি তার আবশ্যকমত বিশ্রাম পায় তবে। কারণ নিদ্রার উদ্দেশ্য হল শরীরের বিশ্রাম, শরীরস্থ প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবন। কেউ কেউ তপস্যার ভাব বা প্রেরণা নিয়ে শরীরকে আহার ও নিদ্রা থেকে বঞ্চিত করতে চায়—কিন্তু এ রকম করা ভুল। তাতে স্থূল আশ্রয়টি ক্ষয় হতে থাকে।

অবশ্য অতিশ্রান্ত বা ক্ষীয়মাণ দেহাধারকেও যোগশক্তি বা প্রাণশক্তি দীর্ঘকাল সক্রিয় করে রাখতে পারে বটে, কিন্তু একটা সময় আসে যখন এই শক্তি আহরণ আর সহজ হয় না, এমন কি সম্ভবও হয় না। শরীর যাতে তার নিজের কাজ সুষ্ঠু সম্পাদন করতে পারে সেজন্য যা তার প্রয়োজন তা তাকে দিতে হবে। পরিমিত অথচ যথেষ্ট খাদ্য (বিনা লোভে, বিনা বাসনায়), যথেষ্ট নিদ্রা—গুরুভার তামসিক রকমের নয়, এই নিয়ম হওয়া চাই।

*
* *

তুমি যে নিদ্রার বর্ণনা দিয়েছ, যেখানে একটা জ্যোতির্ম্ময় নীরবতা রয়েছে অথবা যে নিদ্রায় শারীরকোষে আনন্দ থাকে, সেগুলি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। অন্যান্য সময়ে যখন তোমার চেতনা থাকে না, সেগুলি গভীর সুপ্তির অবস্থা—তখন তুমি শারীর স্তর হতে বাহির হয়ে মনোময় বা প্রাণময় বা অন্তর্লোকে চলে যাও। তুমি বলছ তুমি অচেতন ছিলে, কিন্তু তার অর্থ শুধু এমনও হতে পারে যে, যা তখন ঘটেছে তার স্মৃতি তোমার নাই; কারণ যখন সাধারণ অবস্থায় আবার ফিরে আসা যায়, তখন চেতনা একরকমে যেন উল্টে যায়, তার একটা অবস্থান্তর বা বিপর্য্যয় ঘটে, যার ফলে নিদ্রায় যা-কিছু অনুভূত হয়েছে সে সকলের হয়ত শেষ ঘটনাটি কিম্বা সবচেয়ে গাঢ় গভীর চিহ্ন যাতে রেখে গিয়েছে তা ছাড়া আর সবই স্থূল চেতনা থেকে অপসৃত হয়, আর মনে হয় সব যেন শূন্য। আর-এক রকম শূন্য অবস্থা আছে, জড়তার অবস্থা—তা কেবল শূন্য নয়, গুরুভার ও স্মরণশক্তিহীন—কিন্তু সে হল যখন অবচেতনের গভীরে বিমূঢ়ভাবে সোজা চলে যাওয়া যায়—এই জড়ের অভ্যন্তরে অবগাহন আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, চেতনাকে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, নিম্নগামী করে, বিশ্রাম না এনে আনে শ্রান্তি—এ হল জ্যোতির্ম্ময় নীরবতার সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিষ।

*
* *

তোমার যা হয়েছিল তা অর্দ্ধনিদ্রা বা সিকি নিদ্রা, এমন কি সিকির সিকি নিদ্রাও নয়—তোমার চেতনা ভিতরে চলে গিয়েছিল ও-রকম অবস্থায় চেতনা সচেতনই থাকে, তবে বাহ্য বস্তুর দিকে তার দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়, খোলা থাকে কেবল আন্তর অনুভূতির দিকে। এই দুটি অবস্থার পার্থক্য তোমার স্পষ্ট করে জানা দরকার—একটি হল নিদ্রা, আর একটি সমাধির আরম্ভ অন্ততঃ (অবশ্য "নির্ব্বিকল্প" নয়!) এই অন্তর্ম্মুখী প্রত্যাহার প্রয়োজন, কারণ মানুষের ক্রিয়াসক্ত মন প্রথম প্রথম অত্যন্ত বহির্ম্মুখী হয়ে থাকে—সুতরাং আন্তর সত্তায় বাস করতে হলে (আন্তর মন, আন্তর প্রাণ, আন্তর শরীর ও অন্তঃপুরুষ) তাকে সম্পূর্ণভাবে অন্তরে চলে যেতে হয়। কিন্তু অভ্যাসের ফলে এমন এক অবস্থায় এসে পৌছান যায় যখন বাহিরে সচেতন থেকেও আন্তর সত্তায় বাস করা যায়, ইচ্ছামত অন্তর্ম্মুখী বা বহির্ম্মুখী অবস্থাটি রাখা যায়; তা হলে তুমি যাকে ভুলবশতঃ নিদ্রা নাম দিয়েছ তার মধ্যে যে রকম, ঠিক সেই রকমই জাগ্রত অবস্থার মধ্যেও সমানভাবে জমাট নিশ্চলতা ও মহত্তর ও শুদ্ধতর চেতনার অবতরণ তোমার হবে।

*
* *

সাধনার অবস্থায় এ ধরণের শারীরিক ক্লান্তি নানা কারণে হতে পারে:

(১) শরীর যতখানি পরিপাক করবার জন্য প্রস্তুত তার বেশি যদি সে গ্রহণ করে। প্রতিকার হল সচেতন নিশ্চলতার মধ্যে শান্তভাবে বিশ্রাম—শক্তি তখন গ্রহণ করা হয় বটে কিন্তু আর কোন উদ্দেশ্যে নয়, শুধু সামর্থ্য ও কর্ম্মঠতা ফিরিয়ে আনবার জন্য।

(২) নিষ্ক্রিয়তা যদি জড়ত্বের রূপ নিয়ে আসে—জড়ত্ব চেতনাকে সাধারণ শারীর-স্তরের দিকে নামিয়ে আনে, আর শরীর শীঘ্রই

ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও তমোভাবের দিকে চলে—এখানে প্রতিকার হল সত্য চেতনার মধ্যে ফিরে যাওয়া, সেখানে বিশ্রাম করা, জড়ত্বের মধ্যে নয়।

(৩) শরীরের অতি শ্রম যদি হয়—তাকে যথেষ্ট নিদ্রা ও বিশ্রাম না দেওয়া হয়। শরীর যোগসাধনার অবলম্বন, কিন্তু শরীরের কর্ম্মশক্তি অফুরন্ত নয়, তার সঞ্চয় প্রয়োজন—বিশ্ব-প্রাণ হতে আহরণ করে তাকে সঞ্জীবিত রাখা যায় বটে, কিন্তু এ রকম সঞ্জীবনেরও সীমা আছে। সাধনায় উন্নতির জন্ত ব্যগ্রতার মধ্যেও একটা মিতাচার প্রয়োজন—মিতাচার, কিন্তু ঔদাসীন্ত বা আলস্ত নয়।

*
* *

ব্যাধি দৈহিক প্রকৃতির মধ্যে কোন ত্রুটির বা দুর্ব্বলতার অথবা প্রতিকূল স্পর্শের দিকে অনাবৃত থাকার পরিচয়। তা ছাড়া নিম্নতর প্রাণে বা দেহাশ্রিত মনে বা অন্তত্র কোন অপ্রকাশ বা অসামঞ্জস্তের সাথেও ব্যাধি সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে।

কেবল শ্রদ্ধা, যোগশক্তি বা ভাগবতশক্তির অবতরণ সহায়েই যদি রোগ দূর করা যায়, তবে ত খুব ভাল কথা। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না, কারণ সমগ্র প্রকৃতিটি ভাগবতশক্তির দিকে উন্মুখ নয়, কিম্বা তাতে সাড়া দিতে পারে না। মন শ্রদ্ধালু হতে পারে, সাড়া দিতে পারে কিন্তু নিম্নতন প্রাণ আর দেহ তাকে অনুসরণ নাও করতে পারে। অথবা মন এবং প্রাণ যদি প্রস্তুত হয়ে থাকে, শরীর সাড়া না দিতে পারে, দিলেও হয়ত দেয় আংশিকভাবে কারণ তার অভ্যাসই হল, একটা বিশেষ রোগ উৎপাদন করে যে সব শক্তি, তাতে সাড়া দেওয়া—আর অভ্যাস প্রকৃতির জড় অংশে একটা দুরপনেয় বৃত্তি। এ সকল ক্ষেত্রে স্থূল উপায়েরও আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে—প্রধান উপায় হিসাবে অবশ্য নয়, দিব্যশক্তির সহায় বা স্থূল-অবলম্বন হিসাবে। উগ্র বা প্রচণ্ড প্রতিষেধ তাই বলে নয়,

শুধু সেই রকম প্রতিষেধ যা শরীরকে বিপর্য্যস্ত না করেও উপকার দেয়।

*
* *

অসুখের আক্রমণ হল নিম্নতন প্রকৃতির আক্রমণ কিম্বা প্রকৃতির মধ্যে কোন দুর্ব্বলতা, ছিদ্র বা সাড়ার সুযোগ অবলম্বন ক'রে প্রতিকূল শক্তির আক্রমণ। আরও অনেক জিনিষ যেমন আসে এবং যাদের বহিষ্কার করে দিতে হয়, এসবও তেমনই আসে বাহির হ'তে। এরকমে তারা আসছে যদি অনুভব করতে পারি, শরীরের ভিতরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই যদি তাদের ঝেড়ে ফেলে দেবার অভ্যাস ও সামর্থ্য অর্জ্জন করি তবে রোগ হ'তে মুক্ত থাকা যায়। এমন কি যখন বোধ হয় ব্যাধির আক্রমণটি ভিতর হতেই আসছে তখনও তার অর্থ হল অবচেতনে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে তাকে ধরা যায় নাই; একবার অবচেতনে স্থান পেলে, যে শক্তি তাকে ওখানে নিয়ে এসেছে সে'ই, শীঘ্র হোক আর বিলম্বে হোক, সেখান থেকে তাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাতে আধারটি আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রবেশ করবার ঠিক পরেই যদি তুমি জানতে পার, তবে তার কারণ অবচেতনার ভিতর দিয়ে না এসে সোজা এসে থাকলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বাহিরে ছিল ততক্ষণ তুমি তাকে ধরতে পার নাই। অনেক সময়েই অসুখের আক্রমণ ঐ রকমে আসে সোজা সামনে দিয়ে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ দিয়ে তির্য্যগ্‌ভাবে—আমাদের আত্মরক্ষার যে প্রধান বর্ম্ম সেই সূক্ষ্মপ্রাণের আবরণটি ভেদ্ করে সে চলে আসে; তবে তাকে ঐ আবরণের মধ্যেই থামিয়ে রাখা যায়, যাতে আর বেশি এগিয়ে স্থূল দেহের মধ্যে প্রবেশ না করে। এ ক্ষেত্রে একটা কিছু ফল অনুভব হয় বটে, যেমন জ্বরজ্বর ভাব, সর্দ্দির ভাব—কিন্তু রোগের পূর্ণ আক্রমণ আর ঘটে না। তাকে আরও আগে থামান যায়; অথবা প্রাণময় আচ্ছাদনটি যদি নিজে থেকেই বাধা দেয়, দৃঢ় সবল ও অখণ্ড থাকে,

তবে অসুখ আদৌ হয় না—আক্রমণের কোন স্থূল ফল হয় না, কোন চিহ্নই রেখে যায় না।

*
* *

ভিতর থেকে রোগের উপর নিশ্চয়ই কাজ করা যায় ও রোগ সারান যায়। তবে কথা, সব সময়ে তা সহজ নয়, কারণ জড়ে অনেক বাধা, তামসিকতার বাধা। অক্লান্ত অধ্যবসায় প্রয়োজন। প্রথমে হয়ত একেবারেই বিফল হতে হয়, কিম্বা রোগের বাহ্য লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ক্রমশঃ শরীরের উপর কিম্বা একটা বিশেষ অসুখের উপরে কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়তর হয়। তা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ উপায় দিয়ে সাময়িক অসুখের আক্রমণ আরোগ্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ—কিন্তু ভবিষ্যতে সে আক্রমণ হতে শরীরকে পূর্ণ মুক্ত রাখা বেশি কঠিন। স্থায়ী রোগ বশে আনা দুরূহতর, দেহের একটা সাময়িক বিপত্তির মত তা সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হতে চায় না। শরীরের উপর দখল যে পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ সে পর্য্যন্ত ভিতরের শক্তি প্রয়োগ করবার পথে এই সকল এবং আরও অন্যান্য ত্রুটি ও বিঘ্ন রয়েছে।

ভিতরের ক্রিয়া দিয়ে তুমি যদি রোগের বৃদ্ধি নিবারণ করতে সক্ষম হও, তবে ঐটুকুই লাভ—তারপর অভ্যাসের দ্বারা শক্তিকে ক্রমে দৃঢ়তর করতে হয় যাতে সে রোগ নিরাময় করতে পারে। মনে রাখবে শক্তিটি যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে দেখা দেয় নাই ততক্ষণ স্থূল উপায়ের আশ্রয় একেবারে প্রত্যাখ্যান না করলেও চলে।

ঔষধ হল মন্দের ভাল—তাকে ব্যবহার করতেই হয় যখন চেতনার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা ভাগবত শক্তিতে সাড়া দেয় না কিম্বা সাড়া দেয় উপরে-উপরে সামান্যভাবে। প্রায়ই জড়-চেতনার কোন অংশ গ্রহণে অক্ষম থাকে—কখন কখন অবচেতন পথরোধ করে থাকে, এমন কি তখন সমগ্র জাগ্রত মন, প্রাণ ও দেহ মুক্তিপ্রদ প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকলেও।

অবচেতনও যদি সম্মতি জানায় তবে ভাগবত শক্তির স্পর্শমাত্রেই কেবল বিশেষ রোগটি যে দূর হয় তা নয়, সেই ধরণের বা শ্রেণীর রোগ ভবিষ্যতে একরকম অসম্ভবই হয়ে দাঁড়ায়।

*
* *

রোগ সম্বন্ধে তোমার যে গবেষণা তাকে বিপজ্জনক মতবাদই বলতে হয়। কারণ, রোগ হল উচ্ছেদ করবার জিনিষ, গ্রহণ করবার, উপভোগ করবার জিনিষ নয়। আধারের মধ্যে রোগ উপভোগ করে এমন কিছু বস্তু আছেই; আর অন্যান্য বেদনার মত রোগের বেদনাকেও একটা সুখকর অনুভবে পরিণত করা সম্ভব। কারণ বেদনা ও সুখ উভয়ে একই মূল আনন্দের বিকৃতি, তাদের একটিকে অপরটির ধারায় পরিবর্ত্তিত করা যায় অথবা তাদের মূল তত্ত্ব যে আনন্দ তাতেও রূপান্তরিত করে ধরা যায়। আর এও সত্য যে রোগকে স্থিরভাবে, সমতার সাথে ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করবার ক্ষমতা থাকা চাই, এমন যখন এসে পড়েছে তখন এ হিসাবে তাকে স্বীকার পর্য্যন্তও করা যেতে পারে যে, জীবনে অনুভূতির প্রবাহে তারও অনুভূতির ভিতর দিয়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু তাকে বরণ করা, উপভোগ করা অর্থ তাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে সাহায্য করা—তা চলবে না। রোগ দেহপ্রকৃতির একটা বিকৃতি, ঠিক যেমন কাম ক্রোধ ঈর্ষা প্রভৃতি প্রাণপ্রকৃতির সব বিকৃতি অথবা প্রমাদ পক্ষপাত মিথ্যার প্রশ্রয় হল মানসপ্রকৃতির বিকৃতি। এ সব জিনিষই দূর করতে হবে—দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন প্রত্যাখ্যান করা, তা না করে বরণ করলে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হবে।

*
* *

সব রোগই স্থূলদেহে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মচেতনার ও সূক্ষ্ম-শরীরের যে স্নায়ু-সমষ্টি-গ্রথিত আচ্ছাদন অর্থাৎ শারীর-প্রাণময় কোষ তা

ভেদ করে আসে। সূক্ষ্মদেহের চেতনা যদি থাকে অথবা সূক্ষ্মচেতনা নিয়ে যদি সচেতন হওয়া যায়, তা হলে রোগকে পথের মাঝে বন্ধ করা যায়, স্থূলদেহে তার প্রবেশ নিবারণ করা যায়। কিন্তু অলক্ষ্যে, কিম্বা ঘুমের মধ্যে, কি অবচেতনার ভিতর দিয়ে অথবা অসতর্ক অবস্থায় হঠাৎ সবেগে সে এসে থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে শরীরের উপর যে দখল ইতিমধ্যেই সে পেয়ে বসেছে, যুদ্ধ করে সেখান থেকে তাকে হটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নাই। এই সব আন্তর উপায় দ্বারা আত্মরক্ষণ এত দৃঢ় হতে পারে যে শরীর কার্য্যতঃ রোগাতীতই হয়ে ওঠে—অনেক যোগীর শরীর এই রকমের। তবে এই "কার্য্যতঃ" অর্থ "পূর্ণতঃ" নয়। পূর্ণ রোগাতীত অবস্থা আসতে পারে কেবল অতিমানস পরিবর্ত্তনের সাথে। কারণ অতিমানসের নীচে, এ অবস্থা হল অনেক শক্তির মধ্যে একটা বলবত্তর শক্তির ক্রিয়ার ফল—তার ব্যতিক্রম হতে পারে, যে স্থিতি লাভ হয়েছে তা ভেঙ্গে পড়লে; কিন্তু অতিমানসে তা হল প্রকৃতির স্বধর্ম্ম—অতিমানস-রূপান্তরিত দেহে রোগাতীত অবস্থা স্বতঃসিদ্ধ, নব স্বভাবের অঙ্গীভূত।

অতিমানস প্রকৃতি আর মানস ও নিম্নতন স্তরসমূহের যোগশক্তি, উভয়ে পার্থক্য আছে। শরীর-মনোময় চেতনায় যোগশক্তির বলে যা অর্জ্জন করা যায় ও ধরে রাখা যায়, অতিমানসে সে জিনিষ স্বভাবগত, সিদ্ধির ফলে তার স্থান সেখানে হয় নাই, অতিমানসের প্রকৃতিই তাই—তা আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্ভু।

———